(গদ্য ও কবিতা)

একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণি

বিড়াল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬এ জুন (১৩ই আষাঢ় ১২৪৫ বঙ্গাব্দ) পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা ভাষার প্রথম শিল্পসম্মত উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব তাঁরই। তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম স্নাতকদের মধ্যে তিনি একজন। পেশাগত জীবনে তিনি ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। এ চাকরিসূত্রে খুলনায় ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগদান করে তিনি নীলকরদের অত্যাচার দমন করেছিলেন। দায়িত্ব পালনে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান, যোগ্য বিচারক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। বাংলা সাহিত্যচর্চার অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন তিনি। উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনার বাইরে 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ তাঁর অন্যতম কীর্তি।

১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে 'সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যচর্চার শুরু। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থসংখ্যা ৩৪। তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো : কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, রাধারাণী, রজনী, সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী, রাজসিংহ। 'Rajmohons Wife'

নামে একটি ইংরেজি উপন্যাসও তিনি রচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ভাষা ও সামাজবিষয়ক অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। লোকরহস্য, বিজ্ঞানরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর, সাম্য, কৃষ্ণচরিত্র, বিবিধ প্রবন্ধ ইত্যাদি তাঁর গদ্যগ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি 'সাহিত্যসম্রাট' উপাধিতে ভূষিত হন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ই এপ্রিল কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

.

মূলরচনা-১

===========

আমি শয়নগৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিটমিট করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে-দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই-এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, 'মেও'! চাহিয়া দেখিলাম-হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকট আফিং ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতোপূর্ব্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভালো নহে। ডিউক বলিল, 'মেও'!

.

মূলরচনা-২

.

তখন চক্ষু চাহিয়া ভালো করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মার্জার;

প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি তখন ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই। এক্ষণে মার্জারসুন্দরী, নির্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, 'মেও'! বলিতে পারি না, বুঝি তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি, মার্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, 'কেহ মনের বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই'। বুঝি সে 'মেও'! শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব, 'তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি-এখন বল কী'?

.

মূলরচনা-৩

.

বলি কী? আমি তো ঠিক করিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই। সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়ালে দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুল কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কী জানি, এই মার্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতরচিত্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবি®কৃত করিয়া সগর্বে মার্জারীর প্রতি ধাবমান হইলাম।

.

মূলরচনা-৪.

মার্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোনো লক্ষণ

; বুঝি, মাজF ার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া
ভাবিতেছিল, '=কহ মনের বিল =ছঁচে, =কহ খায় কই'। বুঝি =স '=মও'! শে একটু মন
বুঝিবার অভি1ায় ছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব, '=তামার দুধ ত খাইয়া বি

প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, একটু সরিয়া বসিল। বলিল, 'মেও'! প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জারের বক্তব্যসকল বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, মারপিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কী? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে- আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয় সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।

.

মূলরচনা-৫

.

দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম কী? পরোপকারই পরম ধর্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল- অতএব তুমি সেই পরম ধর্মের ফলভাগী-আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্মের সহায়। দেখ, 'আমি চোর বটে কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্মিক।' তাঁহাদের

চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম চোরের নহে- চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনী। চোর দোষী বটে কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?

.

মূলরচনা-৬

.

দেখ, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকের মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত, নরদমায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়। তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কী প্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মতো দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখনো অন্ধকে মুষ্টি-ভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না-সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটলোকের দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে?

.

মূলরচনা-৭

.

দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালংকার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং জোড়হাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশি? তা তো নয়- তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির

রোগ-দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন করে-আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর-ছি! ছি! ‘দেখ, আমাদিগের দশা দেখ, দেখ প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে প্রাসাদে প্রাসাদে মেও মেও করিয়া আমরা চারিদিক দৃষ্টি করিতেছি-কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল- গৃহমার্জার হইয়া, বৃদ্ধের নিকট যুবতী ভার্যার সহোদর, বা মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলোয়াড়ের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল-তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয় এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জার কবি হইয়া পড়ে।

.

মূলরচনা-৮

.

‘আর, আমাদিগের দশা দেখ-আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে-জিহ্বা ঝুলিয়া পরিয়াছে-অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, ‘মেও! মেও! খাইতে পাই না!’- আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও- নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী, কেন না আফিংখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না যে ধনীর দোষেই দরিদ্রে চোর হয়? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচশত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে। কেননা অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।’

.

মূলরচনা-৯

.

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, 'থাম! থাম মার্জারপণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিস্টিক! সমাজ বিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।' মার্জার বলিল, না হাইলে ত আমার কী? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কী ক্ষতি? আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, 'সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই' বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, 'আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কী করিব?'

.

মূলরচনা-১০

.

বিড়ালকে বুঝান দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিনকালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জার সুবিচারক এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, 'সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন। অতএব চোরে দণ্ডবিধান কর্তব্য। মার্জারী মহাশয় বলিলেন, চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে

তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে নসীরাম বাবুর ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড় তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।

.

মূলরচনা-১১

.

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জারকে বলিলাম যে, ‘এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউমান ও পার্করের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পরিলেও কিছু উপকার হইতে পারে-আর কিছু হউক বা না হউক, আফিঙের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও, উভয় ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীর হও তবে পুনর্বার আসিও, এক সরিষাভোর আফিং দিব।

মার্জার বলিল, আফিঙের বিশেষ প্রয়োজন নাই তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে। মার্জার বিদায় হইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল!

শব্দার্থ ও টীকা

• চারপায়ী : টুল বা চৌকি

• প্রেতবৎ : প্রেতের মতো

• নেপোলিয়ন : ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১) প্রায় সমগ্র ইউরোপে

নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ওয়াটার্লু যুদ্ধে

ওয়েলিংটন ডিউকের হাতে পরাজিত হয়ে তিনি সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হন

এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন

• ওয়েলিংটন : বীর যোদ্ধা, তিনি ডিউক অফ ওয়েলিংটন নামে পরিচিত (১৭৬৯ - ১৮৫৪),

ওয়াটার্লু যুদ্ধে তাঁর হাতে নেপোলিয়ন পরাজিত হন

• ডিউক : ইউরোপীয় সমাজের বনেদি বা অভিজাত ব্যক্তি

• মার্জার : বিড়াল

• ব্যূহ রচনা : প্রতিরোধ বেষ্টনী তৈরি করা, যুদ্ধের জন্য সৈন্য সাজানো

• প্রকটিত : তীব্রভাবে প্রকাশিত

• যষ্টি : লাঠি

• দিব্যকর্ণ : ঐশ্বরিকভাবে শ্রবণ করা

• ঠেঙ্গালাঠি : প্রহার করার লাঠি

• শিরোমণি : সমাজপতি, সমাজের প্রধান ব্যক্তি

• ন্যায়ালংকার : ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত

• ভার্যা : স্ত্রী, বউ

• সতরঞ্চ খেলা : নিচে (মাটিতে) বিছিয়ে যে খেলা খেলতে হয়, পাশা খেলা, দাবা খেলা

• লাঙ্গুল : লেজ, পুচ্ছ

• সোশিয়ালিস্টিক : সমাজতান্ত্রিক, সমাজের সবাই সমান-এমন একটি রাজনৈতিক মতবাদ

• নৈয়ায়িক : ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি

• কস্মিনকালে : কোনো সময়ে

• মার্জারী মহাশয়া : স্ত্রী বিড়াল

• জলযোগ : হালকা খাবার, টিফিন সরিষাভোর, ক্ষুদ্র অর্থে (উপমা)

• পতিত আত্মা : বিপদগ্রস্ত বা দুর্দশাগ্রস্ত আত্মা, এখানে বিড়ালকে বোঝানো হয়েছে

পাঠ-পরিচিতি

==============

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রসাত্মক ও ব্যঙ্গধর্মী রচনার সংকলন 'কমলাকান্তের দপ্তর'। তিন অংশে বিভক্ত এই গ্রন্থে যে কটি গল্প আছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা হলো 'বিড়াল'। একদিন কমলাকান্ত নেশায় বুঁদ হয়ে ওয়াটার্লু যুদ্ধ নিয়ে ভাবছিলেন। এমন সময় একটা বিড়াল এসে কমলাকান্তের জন্য রাখা দুধটুকু খেয়ে ফেলে। ঘটনাটা বোঝার পর তিনি লাঠি দিয়ে বিড়ালটিকে মারতে উদ্যত হন। মানুষের কাজ যারা অসহায় নিরন্ন তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া। কিন্তু

তারা তা করে না। ‘বিড়াল’ গল্পে বিড়ালকে তার প্রাপ্য খাদ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সে তিন দিন না খেয়ে পরে দুধ চুরি করে খেয়ে ফেললেও কমলাকান্ত তাকে মারতে পারেনি তার ক্ষুধার যন্ত্রণা নিজের অনুভূতিতে বিবেচনা করে। এমনকি চুরি থেকে তাকে বিরত হওয়ার উপদেশ দিয়ে তার পরের দিনে জলযোগের সময় ছানা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে কমলাকান্ত আনন্দবোধ করে। তখন কমলাকান্ত ও বিড়ালটির মধ্যে কাল্পনিক কথোপকথন চলতে থাকে। এর প্রথম অংশ নিখাত হাস্যরসাত্মক, পরের অংশ গূঢ়ার্থে সন্নিহিত। বিড়ালের কণ্ঠে পৃথিবীর সকল বঞ্চিত, নিষ্পেষিত, দলিতের ক্ষোভ-প্রতিবাদ-কর্মবেদনা যুক্তিগ্রাহ্য সাম্যতাত্ত্বিক সৌকর্যে উচ্চারিত হতে থাকে, ‘আমি চোর বটে কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া ওঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্ম্মিক।’ মাছের কাঁটা, পাতের ভাত-যা দিয়ে ইচ্ছে করলেই বিড়ালের ক্ষিধে দূর করা যায়। লোকজন তা না করে সেই উচ্ছিষ্ট খাবার নর্দমায় ফেলে দেয়। যে ক্ষুধার্ত নয় তাকেই বেশি করে খাওয়াতে চায়। ক্ষুধাকাতর-শ্রীহীনদের প্রতি ফিরেও তাকায় না। এমন ঘোরতর অভিযোগ আনে বিড়ালটি। বিড়ালের ‘সোশিয়ালিস্টিক’, ‘সুবিচারিক’, ‘সুতার্কিক’ কথা শুনে বিস্মিত ও যুক্তিতে পর্যুদস্ত কমলাকান্তের মনে পড়ে আত্মরক্ষামূলক শ্লেষাত্মক বাণী-বিজ্ঞ লোকের মতো এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে এবং তিনি সেরকম কৌশলের আশ্রয় নাই সাম্যাবাদবিমুখ, ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষের একজন সরকারি কর্মকর্তা হয়েও বঙ্কিমচন্দ্র একটা বিড়ালের মুখ দিয়ে শোষক-শোষিত, ধনী-দরিদ্র, সাধু-চোরের অধিকারবিষয়ক সংগ্রামের কথা কী শ্লেষাত্মক, যুক্তিনিষ্ঠ ও সাবলীল ভাষা ও রূপকাশ্রয়ে উপস্থাপন করেছেন তা এ গল্প পাঠ করে উপলব্ধি করা যায়। এখানে লেখক দুই শ্রেণির মানুষের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের

কথা বলেছেন। এর মধ্যে কথকের জবানিতে দুই শ্রেণির মানুষের স্ব স্ব পক্ষের যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। দুই শ্রেণির একটিতে কথক নিজে এবং অন্যটিতে চোর বিড়াল। কথক নিজেকে সমাজের লোভী, ধনাঢ্য শ্রেণির পর্যায়ে রেখে সমাজে ধনের বৃদ্ধি হওয়া কেনো জরুরি তা বিড়ালের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন।

অপরিচিতা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ এ বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জননী সারদা দেবী।

.

বিশ্বকবি অভিধায় সম্ভাষিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প রচয়িতা এবং ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ শিল্পি। তাঁর লেখনীতেই বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব, বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটেছে। তাঁর ছোটগল্প বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলোর সমতুল্য। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে মাত্র ষোল বছর বয়সে ‘ভিখারিনী’ গল্প রচনার মাধ্যমে ছোটগল্প লেখক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এর পর থেকে জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত দীর্ঘ চৌষট্টি বছরে তিনি অখণ্ড ‘গল্পগুচ্ছে’ সংকলিকত ৯৫টি ছোটগল্প রচনা করেছেন। এর বাহিরেও ‘সে’, ‘গল্পসল্প’ ও ‘লিপিকা’ গ্রন্থে রয়েছে তাঁর আরও

গল্প সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সর্বশেষ গল্পটির নাম 'মুসলমানীর গল্প'।

.

পারিবারিক জমিদারি তদারকির সূত্রে কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বসবাসের কালই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পরচনার স্বর্ণযুগ। 'সোনার তরী' কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোও তিনি একই সময়ে রচনা করেন। প্রকৃতির পটে জীবনকে স্থাপনকরে জীবনের গতিময় বিশ্বজনীন প্রকাশই রবীন্দ্রগল্পের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তবে বিশ শতকের রচিত গল্পে প্রকৃতি ও গীতময়তার স্থলে বাস্তবতাই প্রাধান্য পেয়েছে। গল্পকার হিসেবে তিনি যেমন বরেণ্য, ঔপন্যাসিক হিসেবেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান সুনির্দিষ্ট।

.

তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে 'চোখের বালি', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাহিরে', 'শেষের কবিতা', 'যোগাযোগ' বাংলা উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। নাটক রচনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। তাঁর রচিত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাট্যগ্রন্থগুলো হলো : 'রাজা', 'অচলায়তন', 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী'।

.

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ) জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনাবসান ঘটে।

.

মূলরচনা-১

আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈরঘ্যের হিসাবে বড়, না গুণের হিসাবে। তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মতো যাহার বুকের

উপরে ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মতো গুটি ধরিয়া উঠিয়াছে। সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোটো, তাহাকে ছোটো করিয়াই লিখিব। ছোটোকে যাঁহারা সামান্য বলিয়া ভুল করেন না তাঁহারা ইহার রস বুঝিবেন। কলেজে যতগুলো পরীক্ষা পাস করিবার সব আমি চুকাইয়াছি। ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া, বিদ্রুপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাতে তখন বড়ো লজ্জা পাইতাম; কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিয়াছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে সুরূপ এবং পণ্ডিতমশায়দের মুখে বিদ্রূপ আবার যেন অমনি করিয়াই প্রকাশ পায়।

.

আমার পিতা এককালে গরিব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সময় নিমেষমাত্রও পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন সেই তাঁর প্রথম অবকাশ। আমার তখন বয়স অল্প। মার হাতেই আমি মানুষ। মা গরিবের ঘরের মেয়ে; তাই, আমরা যে ধনী এ কথা তিনিও ভোলেন না, আমাকে ভুলিতে দেন না। শিশুকালে আমি কোলে কোলেই মানুষ-বোধ করি, সেইজন্য শেষ পর্যন্ত আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না। আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অন্নপূর্ণা কোলে গজাননের ছোট ভাইটি। আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেয়ে বড়োজোর বছর ছয়েক বড়। কিন্তু ফল্গুর বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে না খুঁড়িয়া এখানকার এক গণ্ডূষ রস পাইবার জো নাই। এই কারণে কোনো কিছুর জন্যই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হয় না। কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার

করিবেন, আমি সৎপাত্র। তামাকটুকু পর্যন্ত খাই না। ভালোমানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালোমানুষ। মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে- বস্তুত, না মানিবার ক্ষমতা আমার নাই। অন্তঃপুরের শাসনে চলিবার মতো করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি, যদি কোনো কন্যা স্বয়ম্বরা হন তবে এই সুলক্ষণটি স্বরণ রাখিবেন।

.

মূলরচনা-২

.

অনেক বড়ো ঘর হইতে আমার সম্বন্ধ আসিয়াছিল। কিন্তু মামা, যিনি পৃথিবীতে আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট, বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর একা বিশেষ মত ছিল। ধনীর কন্যা তাঁর পছন্দ নয়। আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়া আসিবে, এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি আসক্তি তাঁর অস্থিমজ্জায় জড়িত। তিনি এমন বেহাই চান যাহার টাকা নাই অথচ যে টাকা দিতে কসুর করিবে না। যাহোক শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গুড়গুড়ির পরিবর্তে বাঁধা হুঁকায় তামাক দিলে যাহার নালিশ খাটিবে না। আমার বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে। সে ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়া আমার মন উতলা করিয়া দিল। সে বলিল, æওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে।” কিছুদিন পূর্বেই এমএ পাশ করিয়াছি। সামনে যত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধূ ধূ করিতেছে; পরীক্ষা নাই, উমেদরি নাই, চাকরি নাই; নিজের বিষয় দেখিবার চিন্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই- থাকিবার মধ্যেও ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা। এই অবকাশের মরুভূমির মধ্যে আমার হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা দেখিতেছিল আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতাসে তাহার নিঃশ্বাস, তরুমর্মরে তাহার গোপন কথা।

.
এমন সময় হরিশ আসিয়া বলিল, æমেয়ে দি বল, তবে-”। আমার শরীর-মন বসন্তবাতাসে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মতো কাঁপিতে আলোছায়া বুনিতে লাগিল। হরিশ মানুষটা ছিল রসিক, রস দিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল তৃষার্ত। আমি হরিশকে বলিলাম, æএকবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখো।” হরিশ আসর জমাইতে অদ্বিতীয়। তাই সর্বত্রই তাহার খাতির। মামাও তাহাকে পাইলে ছাড়িতে চান না। কথাটা তাঁর বৈঠকে উঠিল। মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গুরুতর। বাপের অবস্থা তিনি যেমনটি চান তেমনি। এক কালে ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল। এখন তাহা শূন্য বলিলেই হয়, অথচ তলায় সামান্য কিছু বাকি আছে। দেশে বংশমর্যাদা রাখিয়া চলা সহজ নয় বলিয়া ইনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গরিব গৃহস্থের মতোই থাকেন। একটি মেয়ে ছাড়া তাঁর আর নাই। সুতরাং তাহারই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘটটি একেবারে উপুড় করিয়া দিতে দ্বিধা হইবে না।
.
মূলরচনা-৩
.
এসব ভালো কথা। কিন্তু, মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল। বংশে তো কোনো দোষ নাই? না, দোষ নাই-বাপ কোথাও তাঁর মেয়ের যোগ্য বর খুঁজিয়া পান না। একে তো বরের হাট মহার্ঘ, তাহার পরে ধনুক-ভাঙা পণ, কাজেই বাপ কেবলই সবুর করিতেছেন-কিন্তু মেয়ের বয়স সবুর করিতেছে না। যাই হোক, হরিশের সরস রসনার গুণ আছে। মামার মন নরম হইল। বিবাহের ভূমিকা-অংশটা নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। কলিকাতার বাহিরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে

সমস্তটাকেই মামা আন্ডামান দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া জানেন। জীবনে একবার বিশেষ কাজে তিনি কোন্নগর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। মামা যদি মনু হইতেন তবে তিনি হাবড়ার পুল পার হওয়াটাকে তাঁর হার সংহিতায় একেবারে নিষেদ করিয়া দিতেন। মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল, নিজের চোখে মেয়ে দেখিয়া আসিব। সাহস করিয়া প্রস্তাব করিতে পারিলাম না। কন্যাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য যাহাকে পাঠানো হইল সে আমাদের বিনুদাদা, আমার পিস্তুতো ভাই। তাহার মতো রুচি এবং দক্ষতার ’পরে আমি ষোলো-আনা নির্ভর করিতে পারি। বিনুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, æমন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে!” বিনুদাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট। যেখানে আমরা বলি ‘চমৎকার’ সেখানে তিনি বলেন ‘চলনসই’। অতএব বুঝিলাম, আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই।

.

বলা বাহুল্য, বিবাহ-উপলক্ষে কন্যাপক্ষকেই কলিকাতায় আসিতে হইল। কন্যার পিতা শম্ভুনাথবাবু হরিশকে কত বিশ্বাস করেন তাহার প্রমাণ এই যে, বিবাহের তিন দিন পূর্বে তিনি আমাকে প্রথম চক্ষে দেখেন এবং আশীবার্দ করিয়া যান। বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু এপার বা ওপারে। চুল কাঁচা, গোঁফে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। সুপুরুষ বটে। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে সকলের আগে তাঁর উপরে চোখ পড়িবার মতো চেহারা। আশা করি আমাকে দেখিয়া তিনি খুশি হইয়াছিলেন। বোঝা শক্ত, কেননা তিনি বড়ই চুপচুপ। যে দুটি-একটি কথা বলেন যেন তাহাতে পুরা জোর দিয়ে বলেন না। মামার মুখ তখন অনর্গল ছুটিতেছিল-ধনে মানে আমাদের স্থান যে শহরের কারও চেয়ে কম নয়, সেইটেকেই তিনি নানা প্রসঙ্গে প্রচার করিতেছিলেন। শম্ভুনাথবাবু এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না-কোনো ফাঁকে একটা হুঁ বা হ্যাঁ

কিছুই শোনা গেল না। আমি হইলে দমিয়া যাইতাম, কিন্তু মামাকে দমানো শক্ত। তিনি শম্ভুনাথবাবুর চুপচাপ ভাব দেখিয়া ভাবিলেন, লোকটা নিতান্ত নির্জীব, একেবারে কোনো তেজ নাই। বেহাই-সম্প্রদায়ের আর যাই থাক, তেজ থাকাটা দোষের, অতএব মামা মনে মনে খুশি হইলেন। শম্ভুনাথবাবু যখন উঠিলেন তখন মামা সংক্ষেপে উপর হইতেই তাঁকে বিদায় করিলেন, গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেলেন না।

.

মূলরচনা-৪

.

পণ সম্বন্ধে দুই পক্ষে পাকাপাকি কথা ঠিক হইয়া গিয়াছিল। মামা নিজেকে অসামান্য চুতর বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন। কথাবার্তায় কোথাও তিনি কিছু ফাঁক রাখেন নাই। টাকার অঙ্ক তো স্থির ছিলই, তারপরে গহনা কত ভরির এবং সোনা কত দরের হইবে সেও একেবারে বাঁধাবাঁধি হইয়া গিয়াছিল। আমি নিজে এ সমস্ত কথার মধ্যে ছিলাম না; জানিতাম না দেনাপাওয়া কী স্থির হইল। মনে জানিতাম, এই স্থূল অংশটাও বিবাহের একটা প্রধান অংশ, এবং সে অংশের ভার যার উপরে তিনি এক কড়াও ঠকিবেন না। বস্তুত, আশ্চর্য পাকা লোক বলিয়া মামা আমাদের সমস্ত সংসারের প্রধান গর্বের সামগ্রী। যেখানে আমাদের কোনো সম্বন্ধ আছে সেখানে সর্বত্রই তিনি বুদ্ধির লড়াইয়ে জিতিবেন, এ একেবারে ধরা কথা, এই জন্য আমাদের অভাব না থাকিলেও এবং অন্য পক্ষের অভাব কঠিন হইলেও জিতিব, আমাদের সংসারের এই জেদ-ইহাতে যে বাঁচুক আর যে মরুক।

.

গায়ে-হলুদ অসম্ভব রকম ধুম করিয়া গেল। বাহক এত গেল যে তাহার আদম-সুমারি করিতে হইলে কেরানি রাখিতে হয়। তাহাদিগকে বিদায় করিতে অপর পক্ষকে যে

নাকাল হইতে হইবে, সেই কথা স্মরণ করিয়া মামার সঙ্গে মা একযোগে বিস্তর হাসিলেন। ব্যান্ড, বাঁশি, শখের কন্সার্ট প্রভৃতি যেখানে যতপ্রকার উচ্চ শব্দ আছে সমস্ত একসঙ্গে মিশাইয়া বর্বর কোলাহলের মত্ত হস্তী দ্বারা সংগীত সরস্বতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। আংটিতে হারেতে জরি-জহরাতে আমার শরীর যেন গহনায় দোকান নিলামে চড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের ভাবী জামাইয়ের মূল্য কত সেটা যেন কতক পরিমাণে সর্বাঙ্গে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে চলিয়াছিলাম।

.

মামা বিবাহ-বাড়িতে ঢুকিয়া খুশি হইলেন না। একে তো উঠানটাতে বরযাত্রীদের জায়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত, তাহার পরে সমস্ত আয়োজন নিতান্ত মধ্যম রকমের। ইহার পরে শম্ভুনাথবাবুর ব্যবহারটাও নেহাত ঠান্ডা। তাঁর বিনয়টা অজস্র নয়। মুখে তো কথাই নাই কোমরে চাদর বাঁধা, গলা-ভাঙা, টাক-পড়া, মিশ-কালো এবং বিপুল শরীর তাঁর একটি উকিল-বন্ধু যদি নিয়ত হাত জোড় করিয়া মাথা হেলাইয়া, নরতার স্মিতহাস্যে ও গদগদ বচনে কন্সার্ট পার্টির করতাল বাজিয়ে হইতে শুরু করিয়া বরকর্তাদের প্রত্যেককে বার বার প্রচুররূপে অভিষিক্ত করিয়া না দিতেন তবে গোড়াতেই এটা এস্পার-ওস্পার হইত।

.

আমি সভায় বসিবার কিছুক্ষন পরেই মামা শম্ভুনাথবাবুকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কী কথা হইল জানি না, কিছুক্ষণ পরেই শম্ভুনাথবাবু আমাকে আসিয়া বলিলেন, æবাবাজি, একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে।”

.

মূলরচনা-৫

.

ব্যাপারখানা এই।-সকলের না হউক, কিন্তু কোনো কোনো মানুষের জীবনের একটা কিছু লক্ষ্য থাকে। মামার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠকিবেন না। তাঁর ভয় তাঁর বেহাই তাঁকে গহনায় ফাঁকি দিতে পারেন-বিবাহকার্য শেষ হইয়া গেলে সে ফাঁকির আর প্রতিকার চলিবে না। বাড়িভাড়া সওগাদ লোক-বিদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরকম টানাটানির পরিচয় পাওয়া গেছে তাহাতে মামা ঠিক করিয়াছিলেন-দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে এ লোকটির শুধু মুখের কথার উপর ভর করা চলিবে না। সেইজন্য বাড়ির স্যাকরাকে সুদ্ধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম, মামা এক তক্তপোশে এবং স্যাক্রা তাহার দাঁড়িপাল্লা কষ্টিপাথর প্রভৃতি লাইয়া মেজেয় বসিয়া আছে। শম্ভুনাথবাবু আমাকে বলিলেন, æতোমার মামা বলিতেছেন বিবাহের কাজ শুরু হইবার আগেই তিনি কনের সমস্ত গহনা যাচাই করিয়া দেখিবেন, ইহাতে তুমি কী বল।" আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। মামা বলিলেন, æও আবার কী বলিবে। আমি যা বলিব তাই হইবে।" শম্ভুনাথবাবু আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, æসেই কথা তবে ঠিক? উনি যা বলিবেন তাই হইবে? এ সম্বন্ধে তোমার কিছুই বলিবার নাই?" আমি একটু ঘাড়-নাড়ার ইঙ্গিতে জানাইলাম, এসব কথায় আমার সম্পূর্ণ অনধিকার। æআচ্ছা তবে বোসো, মেয়ের গা হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া আনিতেছি।" এই বলিয়া তিনি উঠিলেন। মামা বলিলেন, æঅনুপম এখানে কী করিবে। ও সভায় গিয়া বসুক।"

.

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, æনা, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে।" কিছুক্ষণ পরে তিনি একখানা গামছায় বাঁধা গহনা আনিয়া তক্তপোশের উপর মেলিয়া ধরিলেন।

সমস্তই তাঁহার পিতামহীদের আমলের গহান-হাল ফ্যাশনের সূক্ষ্ম কাজ নয়-যেমন মোটা তেমনি ভারী। স্যাকরা গহনা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, æএ আর দেখিব কী। ইহাতে খাদ নাই-এমন সোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না।” এই বলিয়া সে মকরমুখা মোটা একটা বালায় একটু চাপ দিয়া দেখাইল তাহা বাঁকিয়া যায়। মামা তখনই নোটবইয়ে গহনাগুলির ফর্দ টুকিয়া লইলেন, পাছে যাহা দেখানো হইল তাহার কোনোটা কম পড়ে। হিসাব করিয়া দেখিলেন, গহনা যে পরিমান দিবার কথা এগুলি সংখ্যায় দরে এবং ভারে তার অনেক বেশি। গহানগুলির মধ্যে একজোড়া এয়ারিং ছিল। শম্ভুনাথবাবু সেইটে স্যাকরার হাতে দিয়া বলিলেন, æএইটে একবার পরখ করিয়া দেখো।” স্যাকরা কহিল, æইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে।

.

মূলরচনা-৬

.

শম্ভুনাথবাবু এয়ারিং জোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, æএটা আপনারাই রাখিয়া দিন।” মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাঁহারা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল। দরিদ্র তাঁহাকে ঠকাইতে চাহিবে কিন্তু তিনি ঠকিবেন না এই আনন্দ-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছু উপরি-পাওনা জুটিল। অত্যন্ত মুখ ভার করিয়া বলিলেন, æঅনুপম, যাও, তুমি সভায় গিয়ে বোসো গে।” শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, æনা, এখন সভায় বসিতে হইবে না। চলুন, আগে আপনাদের খাওয়াইয়া দিই।” মামা বলিলেন, æসে কী কথা। লগ্ন-” শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, æসেজন্য কিছু ভাবিবেন না-এখন উঠুন।” লোকটি নেহাত ভালোমানুষ-ধরনের, কিন্তু ভিতরে বেশ একটু জোর আছে বলিয়া

বোধ হইল। মামাকে উঠিতে হইল। বরযাত্রীদেরও আহার হইয়া গেল। আয়োজনের আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু রান্না ভালো এবং সমস্ত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া সকলেরই তৃপ্তি হইল। বরযাত্রীদের খাওয়া শেষ হইলে শম্ভুনাথবাবু আমাকের খাইতে বলিলেন। মামা বলিলেন, æসে কী কথা। বিবাহের পূর্বে বর খাইবে কেমন করিয়া।”

.

এ সম্বন্ধে মামার কোনো মতপ্রকাশকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, æতুমি কী বল। বসিয়া যাইতে দোষ কিছু আছে?” মূর্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা-স্বরূপে মামা উপস্থিত, তাঁর বিরুদ্ধে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আহারে বসিতে পারিলাম না। তখন শম্ভুনাথবাবু মামাকে বলিলেন, æআপনাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। আমরা ধনী নই, আপনাদের যোগ্য আয়োজন করিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। রাত হইয়া গেছে, আর আপনাদের কষ্ট বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। এখন তবে-” মামা বলিলেন, æতা, সভায় চলুন, আমরা তো প্রস্তুত আছি।” শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, æতবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই?” মামা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, æঠাট্টা করিতেছেন নাকি।” শম্ভুনাথবাবু কহিলেন, æঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।” মামা দুই চোখ এত বড়ো করিয়া মেলিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। শম্ভুনাথ কহিলেন, æআমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।” আমাকে একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না। কারণ, প্রমাণ হইয়া গেছে, আমি কেহই নই। তারপরে যা হইল সে আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। ঝাড়লন্ঠন ভাঙিয়া-চুরিয়া, জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া, বরযাত্রের দল দক্ষযজ্ঞের পালা সারিয়া বাহির হইয়া গেল। বাড়ি ফিরিবার সময় ব্যান্ড রসনচৌকি ও কন্সার্ট একসঙ্গে বাজিল না এবং অভ্রের ঝাড়গুলো আকাশের তারার উপর

আপনাদের কর্তব্যের বরাত দিয়া কোথায় যে মহানিরবাণ লাভ করিল সন্ধান পাওয়া গেল না।

.

মূলরচনা-৭

.

বাড়ির সকলে তো রাগিয়া আগুন। কন্যার পিতার এত গুমর! কলি যে চারপেয়া হইয়া আসিল! সকলে বলি, æদেখি, মেয়ের বিয়ে দেন কেমন করিয়া।” কিন্তু মেয়ের বিয়ে হইবে না এ ভয় যার মনে নাই তার শাস্তির উপায় কি। সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে। এত বড় সৎপাত্রের কপালে এত বড়ো কলঙ্কের দাগ কোন নষ্ট গ্রহ এত আলো জ্বালাইয়া, বাজনা বাজাইয়া, সমারোহ করিয়া আঁকিয়া দিল? বরযাত্রীরা এই বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিল যে, æবিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওয়াইয়া দিল-পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অন্নসুদ্ধ সেখানে টান মারিয়া ফেরিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফসোস মিটিত।”

.

বিবাহের চুক্তিভঙ্গ ও মানহানি দাবিতে নালিশ করিব বলিয়া মামা অত্যন্ত গোল করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হিতৈষীরা বুঝাইয়া দিল, তাহা হইলে তামাশার যেটুকু বাকি আছে তাহা পুরা হইবে। বলা বাহুল্য, আমিও খুব রাগিয়াছিলাম। কোনো গতিকে শম্ভুনাথবাবু বিষম জব্দ হইয়া আমাদের পায়ে ধরিয়া আসিয়া পড়েন, গোঁফের রেখায় তা দিতে দিতে এইটেই কেবল কামনা কারিতে লাগিলাম। কিন্তু এই আক্রোশের কালো রঙের স্রোতের পাশাপাশি আর একটা স্রোত বহিতেছিল যেটার রঙ একেবারেই কালো নয়। সমস্ত মন যে সেই অপরিচিতার পানে ছুটিয়া গিয়াছিল- এখনো যে তাহাকে কিছুতেই টানিয়া ফিরাইতে পারি না। দেয়ালটুকুর আড়ালে রহিয়া

গেল গো। কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল শাড়ি, মুখে তার লজ্জার রক্তিমা, হৃদয়ের ভিতরে কী যে তা কেমন করিয়া বলিব। আমার কল্পলোকের কল্পলতাটি বসন্তের সমস্ত ফুলের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য নত হইয়া পড়িয়াছিল। হাওয়া আসে, গন্ধ পাই, পাতার শব্দ শুনি-কেবল আর একটিমাত্র পা ফেলার অপেক্ষা-এমন সময়ে সেই এক পদক্ষেপের দূরত্বটুকু এক মুহূর্তে অসীম হইয়া উঠিল!

.

এতদিন যে প্রতি সন্ধ্যায় আমি বিনুদাদার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলাম! বিনুদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফূলিঙ্গের মতো আমার মনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য; কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তাহার ছবি, সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া রহিল। বাহিরে তো সে ধরা দিলই না, তাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না-এই জন্য মন সেদিনকার সেই বিবাহসভার দেয়ালটার বাহিরে ভূতের মতো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। হরিশের কাছে শুনিয়াছি, মেয়েটিকে আমার ফটোগ্রাফ দেখানো হইয়াছিল। পছন্দ করিয়াছে বৈকি। না করিবার তো কোনো কারণ নাই। আমার মন বলে, সে ছবি তার কোনো একটি বাক্সের মধ্যে লুকানো আছে। একলা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এক-একদিন নিরালা দুপুরবেলায় সে কি সেটি খুলিয়া দেখে না। যখন ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে তখন ছবিটির উপরে কি তার মুখের দুই ধার দিয়া এলোচুল আসিয়া পড়ে না। হঠাৎ বাহিরে কারও পায়ের শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তার সুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকাইয়া ফেলে না। দিন যায়। একটা বৎসর গেল। মামা তো লজ্জায় বিবাহসম্বন্ধের কথা তুলিতেই পারেন না। মার ইচ্ছা ছিল, আমার অপমানের কথা যখন সমাজের লোকে

ভুলিয়া যাইবে তখন বিবাহের চেষ্টা দেখিবেন।

.

মূলরচনা-৮

.

এদিকে আমি শুনিলাম সে মেয়ের নাকি ভালো পাত্র জুটিয়াছিল, কিন্তু সে পণ করিয়াছে বিবাহ করিবে না। শুনিয়া আমার মন পুলকের আবেশে ভরিয়া গেল। আমি কল্পনায় দেখিতে লাগিলাম, সে ভালো করিয়া খায় না; সন্ধ্যা হইয়া আসে, সে চুল বাঁধিতে ভুলিয়া যায়। তার বাপ তার মুখের পানে চান আর ভাবেন, æআমার মেয়ে দিনে দিনে এমন হইয়া যাইতেছে কেন।" হঠাৎ কোনোদিন তার ঘরে আসিয়া দেখেন, মেয়ের দুই চক্ষু জলে ভরা। জিজ্ঞাসা করেন, æমা, তোর কী হইয়াছে বল আমাকে।" মেয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলে, æকই কিছুই তো হয় নি বাবা।" বাপের এক মেয়ে যে-বড়ো আদরের মেয়ে। যখন অনাবৃষ্টির দিনে ফুলের কুড়িটির মতো মেয়ে একেবারে বিমর্ষ হইয়া পরিয়াছে তখন বাপের প্রাণে আর সহিল না। তখন অভিমান ভাসাইয়া দিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন আমাদের দ্বারে। তার পরে? তার পরে মনের মধ্যে সেই কালো রঙের ধারাটা বহিতেছে সে যেন কালো সাপের মতো রূপ ধরিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল। সে বলিল, æবেশ তো, আর একবার বিবাহের আসর সাজানো হোক, আলো জ্বলুক, দেশ-বিদেশের লোকের নিমন্ত্রণ হোক, তার পরে তুমি বরের টোপর পায়ে দলিয়া দলবল লইয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া এসো।" কিন্তু, যে ধারাটি চোখের জলের মতো শুভ্র সে রাজহংসের রূপ ধরিয়া বলিল, æযেমন করিয়া আমি একদিন দময়ন্তীর পুষ্পবনে গিয়াছিলাম, তেমনি করিয়া আমাকে একবার উড়িয়া যাইতে দাও-আমি বিরহিণীর কানে কানে একবার সুখের খবরটা দিয়া আসি গে।" তার পরে? তার পরে দুঃখের রাত পোহাইল, নববর্ষার জল পড়িল, ম্লান ফুলটি মুখ তুলিয়া একবারে সেই দেয়ালটার বাহিরে রহিল সমস্ত

পৃথিবীর আর সবাই আর ভিতরে প্রবেশ করিল একটিমাত্র মানুষ। তারপরে? তার পরে আমার কথাটি ফুরালো।

.

কিন্তু কথা এমন করিয়া ফুরাইল না। যেখানে আসিয়া তাহা অফুরান হইয়াছে সেখানকার বিবরণ একটুখানি বলিয়া আমার এ লেখা শেষ করিয়া দিই। মাকে লইয়া তীর্থে চলিয়াছিলাম। আমার উপরে ভার ছিল। কারণ মামা এবারেও হাবড়ার পুল পার হন নাই। রেলগাড়িতে ঘুমাইতেছিলাম। ঝাঁকানি খাইতে খাইতে মাথার মধ্যে নানাপ্রকার এলোমেলো স্বপ্নের ঝুমঝুমি বাজিতেছিল। হঠাৎ একা কোন স্টেশনে জাগিয়া উঠিলাম। আলোতে অন্ধকার মেশা সেও এক স্বপ্ন। কেবল আকাশের তারাগুলি চিরপরিচিত-আর সবই অজানা অস্পষ্ট; স্টেশনের দীপ-কয়টা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আলো ধরিয়া এই পৃথিবীটা যে কত অচেনা এবং যাহা চারিদিকে তাহা যে কতই বহু দূরে তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। গাড়ির মধ্যে মা ঘুমাইতেছেন; আলোর নিচে সবুজ পর্দা টানা; তোরঙ্গ বাক্স জিনিসপত্র সমস্তই কে কার ঘাড়ে এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে, তাহার যেন স্বপ্নলোকের উলট-পালট আসবাব, সবুজ প্রদোষের মিটমিটে আলোতে থাকা এবং না-থাকার মাঝখানে কেমন একরকম হইয়া পড়িয়া আছি।

.

মূলরচনা-৯

.

এমন সময়ে সেই অদ্ভুত পৃথিবীর অদ্ভুত রাত্রে কে বলিয়া উঠিল, œশিগগির চলে আয় এই গাড়িতে জায়গা আছে।” মনে হইল, যেন গান শুনিলাম। বাঙালি মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কী মধুর তাহা এমনি করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচমকা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু, এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেয়ের গলা

বলিয়া একটি শ্রেণিভুক্ত করিয়া দেওয়া চলে না, এ কেবল একটি মানুষের গলা; শুনিলেই মন বলিয়া ওঠে, æএমন তো আর শুনি নাই।” চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সত্য। রূপ জিনিসটি বড়ো কম নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনির্বচনীয়, আমার মনে হয় কন্ঠস্বর যেন তারই চেহারা। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির চানালা খুলে বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিলাম, কিছুই দেখিলাম না। প্লাটফর্মের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গার্ড তাহার একচক্ষু লন্ঠন নাড়িয়া দিল, গাড়ি চলিল; আমি জানালার কাছে বসিয়া রহিলাম। আমার চোখের সামনে কোনো মূর্তি ছিল না, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমি একটি হৃদয়ের রূপ দেখিতে লাগিলাম। সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মতো, আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। ওগো সুর, অচেনা কন্ঠের সুর, এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসনটির উপরে আসিয়া বসিয়াছ। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণ তুমি-চঞ্চল কালের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের উপরে ফুলটির মতো ফুটিয়াছ, অথচ তার ঢেউ লাগিয়া একটি পাপড়িও টলে নাই, অপরিমেয় কোমলতায় এতটুকু দাগ পড়ে নাই।

.

গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল; আমি মনের মধ্যে গান শুনিতে শুনিতে চলিলাম। তাহার একটিমাত্র ধুয়া æগাড়িতে জায়গা আছে।” আছে কি, জায়গা আছে কি। জায়গা যে পাওয়া যায় না, কেউ যে কাকেও চেনে না। অথচ সেই না-চেনাটুকু যে কুয়াশামাত্র, সে যে মায়া, সেটা ছিন্ন হইলেই যে চেনার আর অন্ত নাই। ওগো সুধাময় সুর, যে হৃদয়ের অপরূপ রূপ তুমি, সে কি আমার চিরকালের চেনা নয়। জায়গা আছে আছে-শীঘ্র আসিতে ডাকিয়াছ, শীঘ্রই আসিয়াছি, এক নিমেষও দেরি করি নাই। রাত্রে ভালো করিয়া ঘুম হইল না। প্রায় প্রতি স্টেশনে একবার করিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, ভয় হইতে লাগিল যাহাকে দেখা হইল না সে পাছে রাত্রে নামিয়া

যায়। পরদিন সকালে একটা বড় স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে। আমাদের ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট-মনে আশা ছিল, ভিড় হইবে না। নামিয়া দেখি, প্লাটফর্মে সাহেবেদের আর্দালি-দল আসবাবপত্র লইয়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কোন এক ফৌজের বড় জেনারেল সাহেব ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দুই-তিন মিনিট পরেই গাড়ি আসিল। বুঝিলাম, ফার্স্ট ক্লাসের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। মাকে লইয়া কোন গাড়িতে উঠি সে এক বিষম ভাবনায় পড়িলাম। সব গাড়িতেই ভিড়। দ্বারে দ্বারে উঁকি মারিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন সময়ে সেকেন্ড ক্লাসের গাড়ি হইতে একটি মেয়ে আমার মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, æআপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন না-এখানে জায়গা আছে।”

.

মূলরচনা-১০

.

আমি তো চমকিয়া উঠিলাম। সেই আশ্চর্যমধুর কন্ঠ এবং সেই গানেরই ধুয়া- æজায়গা আছে”। ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম। জিনিসপত্র তুলিবার প্রায় সময় ছিল না। আমার মতো অক্ষম দুনিয়ায় নাই। সেই মেয়েটিই কুলিদের হাত হইতে তাড়াতাড়ি চলতি গাড়িতে আমাদের বিছানাপত্র টানিয়া লইল। আমার একটা ফটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা স্টেশনেই পড়িয়া রহিল- গ্রাহ্যই করিলাম না। তারপরে কী লিখিব জানি না। আমার মনের মধ্যে একটা অখণ্ড আনন্দের ছবি আছে-তাহাকে কোথায় শুরু করিব, কোথায় শেষ করিব? বসিয়া বসিয়া বাক্যের পর বাক্য যোজনা করিতে ইচ্ছা করে না।

.

এবার সেই সুরটিকে চোখে দেখিলাম; তখনো তাহাকে সুর বলিয়াই মনে হইল।

মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম তাঁর চোখে পলক পড়িতেছে না। মেয়েটির বয়স ষোলো কি সতেরো হইবে, কিন্তু নবযৌবন ইহার দেহে মনে কোথায় যেন একটুও ভার চাপাইয়া দেয় নাই। ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িমা নাই।

.

আমি দেখিতেছি, বিস্তারিত করিয়া কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। এমন-কি সে যে কী রঙের কাপড় কেমন করিয়া পরিয়াছিল তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। এটা খুব সত্য যে, তার বেশে ভূষায় এমন কিছুই ছিল না যেটা তাহাকে ছাড়াইয়া বিশেষ করিয়া চোখে পড়িতে পারে। সে নিজের চারিদিকের সকলের চেয়ে অধিক- রজনীগন্ধার শুভ্র মঞ্জরীর মতো সরল বৃন্তটির উপরে দাঁড়াইয়া, যে গাছে ফুটিয়াছে সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে দুটি-তিনটি ছোটো ছোটো মেয়ে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া তাহার হাসি এবং কথার আর অন্ত ছিল না। আমি হাতে একখানা বই লইয়া সে দিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিলাম। যেটুকু কানে আসিতেছিল সে তো সমস্তই ছেলেমানুষদের সঙ্গে ছেলেমানুষি কথা। তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহার মধ্যে বয়সের তফাত কিছুমাত্র ছিল না-ছোটদের সঙ্গে সে অনায়াসে এবং আনন্দে ছোট হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গে কতকগুলি ছবিওয়ালা ছেলেদের গল্পের বই- তাহারই কোনো-একটা বিশেষ গল্প শোনাইবার জন্য মেয়েরা তাহাকে ধরিয়া পড়িল। এ গল্প নিশ্চয় তারা বিশ-পঁচিশ বার শুনিয়াছে।

.

মূলরচনা-১১

.

মেয়েদের কেন যে এত আগ্রহ তাহা বুঝিলাম। সেই সুধাকণ্ঠের সোনার কাঠিতে

সকল কথা যে সোনা হইয়া ওঠে। তাই মেয়েরা যখন তার মুখে গল্প শোনে তখন গল্প নয়, তাহাকেই শোনে; তাহাদের হৃদয়ের উপর প্রাণের ঝর্না ঝরিয়া পড়ে। তার সেই উদ্ভাসিত প্রাণ আমার সেদিনকার সমস্ত সূর্যকিরণকে সজীব করিয়া তুলিল; আমার মনে হইল, আমাকে যে প্রকৃতি তাহার আকাশ দিয়া বেষ্ট করিয়াছে সে ঐ তরুণীরই অক্লান্ত অম্লান প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিস্তার। পরের স্টেশনে পৌঁছিতেই খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া সে খুব খানিকটা চানা-মুঠ কিনিয়া লইল এবং মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়া নিতান্ত ছেলেমানুষের মতো করিয়া কলহাস্য করিতে করিতে অসংকোচে খাইতে লাগিল। আমার প্রকৃতি যে জাল দিয়া বেড়া-আমি কেন বেশ সহজে হাসিমুখে মেয়েটির কাছে এই চানা একমুঠা চাহিয়া লইতে পারিলাম না। হাত বাড়াইয়া দিয়া কেন আমার লোভ স্বীকার করিলাম না।

.

মা ভালো-লাগা এবং মন্দ-লাগার মধ্যে দোমনা হইয়াছিলেন। গাড়িতে আমি পুরুষমানুষ, তবু ইহার কিছুমাত্র সংকোচ নাই, বিশেষত এমন লোভীর মতো খাইতেছে, সেটা ঠিক তাঁর পছন্দ হইতেছিল না; অথচ ইহাকে বেহায়া বলিয়াও তাঁর ভ্রম হয় নাই। তাঁর মনে হইল, এ মেয়ের বয়স হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা হয় নাই। মা হঠাৎ কারও সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন না। মানুষের সঙ্গে দূরে দূরে থাকাই তাঁর অভ্যাস। এই মেয়েটির পরিচয় লইতে তাঁর খুব ইচ্ছা, কিন্তু স্বাভাবিক বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময়ে গাড়ি একটা বড়ো স্টেশনে আসিয়া থামিল। সেই জেনারেল-সাহেবের একদল অনুসঙ্গী এই স্টেশন হইতে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে। গাড়িতে কোথাও জায়গা নাই। বার বার আমাদের গাড়ির সামনে দিয়া তারা ঘুরিয়া গেল। মা তো ভয়ে আড়ষ্ট, আমিও মনের মধ্যে শান্তি পাইতেছিলাম না।

.

গাড়ি ছাড়িবার অল্পকাল-পূর্বে একজন দেশি রেলওয়ে কর্মচারী নাম-লেখা দুইখানা

টিকিট গাড়ির দুই বেঞ্চের শিয়রের কাছে লটকাইয়া দিয়া আমাকে বলল, æএই গাড়ির এই দুই বেঞ্জ আগে হইতেই দুই সাহেব রিজার্ভ করিয়াছেন, আপনাদিগকে অন্য গাড়িতে যাইতে হইবে।" আমি তো তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। মেয়েটি হিন্দিতে বলিল, æনা, আমরা গাড়ি ছাড়িব না।" সে লোকটি রোখ করিয়া বলিল, æনা ছাড়িয়া উপায় নাই।" কিন্তু মেয়েটির চলিষ্ণুতার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া সে নামিয়া গিয়া ইংরেজ স্টেশন-মাস্টারকে ডাকিয়া আনিল। সে আসিয়া আমাকে বলিল, æআমি দুঃখিত, কিন্তু-" শুনিয়া আমি 'কুলি কুলি করিয়া ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। মেয়েটি উঠিয়া দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল, æনা, আপনি যাইতে পারিবেন না, যেমন আছেন বসিয়া থাকুন।" বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া স্টেশন-মাস্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল, æএ গাড়ি আগে হইতে রিজারভ করা, এ কথা মিথ্যা কথা।" বলিয়া নাম লেখা টিকিটটি খুলিয়া প্লাটফর্মে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

.

মূলরচনা-১২

.

ইতিমধ্যে আর্দালি-সমেত ইউনিফর্ম-পরা সাহেব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়িতে সে তার আসবাস উঠাইবার জন্য আর্দালিকে প্রথমে ইশারা করিয়াছিল। তাহার পর মেয়েটির মুখে তাকাইয়া, তার কথা শুনিয়া, ভাব দেখিয়া, স্টেশন-মাস্টারকে একটু স্পর্শ করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কী কথা হইল জানি না। দেখা, গাড়ি ছাড়িবার সময় অতীত হইলেও আর-একটা গাড়ি জুড়িয়া তবে ট্রেন ছাড়িল। মেয়েটি তার দলবল লইয়া আবার একপত্তন চানা-মুঠ খাইতে শুরু করিল,

আর আমি লজ্জায় জানলার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম। কানপুরে গাড়ি আসিয়া থামিল। মেয়েটি জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত-স্টেশনে একটি হিন্দুস্থানি চাকর ছুটিয়া আসিয়া ইহাদিগকে নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। মা তখন আর থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, æতোমার নাম কী মা।” মেয়েটি বলিল, æআমার নাম কল্যাণী।” শুনিয়া মা এবং আমি দুজনেই চমকিয়া উঠিলাম। æতোমার বাবা-” æতিনি এখানকার ডাক্তার, তাঁহার নাম শম্ভুনাথ সেন।” তার পরেই সবাই নামিয়া গেল।

.

মামার নিষেধ অমান্য করিয়া, মাতৃ-আজ্ঞা ঠেলিয়া, তার পরে আমি কানপুরে আসিয়াছি। কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। হাত জোড় করিয়াছি, মাথা হেঁট করিয়াছি; শম্ভুনাথবাবুর হৃদয় গলিয়াছে। কল্যাণী বলে, æআমি বিবাহ করিব না।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, æকেন।” সে বলিল, æমাতৃ-আজ্ঞা।” কী সর্বনাশ। এ পক্ষেও মাতুল আছে নাকি। তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে। সেই বিবাহ-ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই সুরটি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজও বাজিতেছে- সে যেন কোন ওপারের বাঁশি-আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল-সমস্ত সংসারের বাহিরে ডাক দিল। আর, সেই-যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল æজায়গা আছে”, সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধুয়া হইয়া রহিল। তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ। এখনো আশা ছাড়ি নাই, কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই। তোমরা মনে করিতেছ, আমি বিবাহের আশা করি? না, কোনো কালেই না। আমার

মনে আছে, কেবল সেই এক রাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা-জায়গা আছে। নিশ্চয়ই আছে। নইলে দাঁড়াব কোথায়। তাই বৎসরের পর বৎসর যায় আমি এইখানেই আছি। দেখা হয়, সেই কণ্ঠ শুনি, যখন সুবিধা পাই কিছু তার কাজ করিয়া দিই-আর মন বলে, এই তো জায়গা পাইয়াছি। ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।

শব্দার্থ ও টীকা

[illegible] 'এ জীবনটা না দৈরঘ্যের হিসাবে বড়ো, না গুণের হিসাবে।'-গল্পের কথক চরিত্র অনুপমের আত্মসমালোচনা। পরিমাণ ও গুণ উভয় দিক দিয়েই যে তার জীবনটি নিতান্তই তুচ্ছ সেকথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

[illegible] ফলের মতো গুটি-গুটি এক সময় পূর্ণ ফলে পরিণত হয়। কিন্তু গুটিই যদি ফলের মতো হয় তাহলে তার অসম্পূর্ণ সারবত্তা প্রকট হয়ে ওঠে। নিজের নিষ্ফল জীবনকে বোঝাতে অনুপমের ব্যবহৃত উপমা।

[illegible] মাকাল ফল-দেখতে সুন্দর অথচ ভেতরে দুর্গন্ধ ও শাঁসযুক্ত খাওয়ার অনুপযোগী ফল। বিশেষ অর্থে গুণহীন।

[illegible] অন্নপূর্ণা-অন্নে পরিপূর্ণা। দেবী দুর্গা।

[illegible] গজানন- গজ আনন যার। গণেশ।

[illegible] ‘আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোট ভাইটি-দেবী দুর্গার দুই পুত্র; অগ্রজ গণেশ ও অনুজ কার্তিকেয়। মা দরগার কোলে থাকা দেব-সেনাপতি কারতিকেয়কে বোঝানো হয়েছে। ব্যঙ্গার্থে প্রয়োগ।

[illegible] ফল্গু-ভারতের গয়া অঞ্চলের অন্তঃসলিল নদী। নদীটির ওপরের অংশে বালির আস্তরণ কিন্তু ভেতরে জলস্রোত প্রবাহিত।

[illegible] ফল্গুর বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন।’-অনুপম তার মামার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে কথাটি বলেছে। সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব পালনে তার ভূমিকা এখানে উপমার মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

[illegible] গণ্ডূষ - একমুখ বা এককোষ জল।

[illegible] অন্তঃপুর-অন্দরমহল। ভেতরবাড়ি

[illegible] স্বয়ংবরা-যে মেয়ে নিজেই স্বামী নির্বাচন করে। গুড়গুড়ি-আলবোলা। ফরসি। দীর্ঘ নলযুক্ত হুঁকাবিশেষ

[illegible] বাঁধা হুঁকা- সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য নারকেল-খোলা তৈরি ধূমপানের যন্ত্রবিশেষ।

[illegible] উমেদারি-প্রার্থনা। চাকরির আশায় অন্যের কাছে ধরনা দেওয়া।

[illegible] অবকাশের মরুভূমি এক কালে ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল।-লক্ষ্মী ধন ও ঐশ্বর্যের দেবী। মঙ্গলঘট তাঁর প্রতীক। কল্যাণীদের বংশে একসময় লক্ষ্মীর কৃপায় ঐশ্বর্যের ঘট পূর্ণ ছিল।

১৩২১ বঙ্গাব্দের (১৯১৪) কার্তিক সংখ্যায়। এটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় রবীন্দ্রগল্পের সংকলন ‘গল্পসপ্তম’-এ এবং পরে, ‘গল্পগুচ্ছ’ তৃতীয় খণ্ডে (১৯২৭)।

‘অপরিচিতা’ গল্পে অপরিচিতা বিশেষণের আড়ালে যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী নারীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তার নাম কল্যাণী। অমানবিক যৌতুক প্রথার নির্মম বলি হয়েছে এমন নারীদের গল্প ইতঃপূর্বে রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এই গল্পেই প্রথম যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের কথকতা শোনালেন তিনি। এ গল্পে পিতা শম্ভুনাথ সেন এবং কন্যা কল্যাণীর স্বতন্ত্র বীক্ষা ও আচরণে সমাজে গেড়ে-বসা ঘৃণ্য যৌতুকপ্রথা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। পিতার বলিষ্ঠ প্রতিরোধ এবং কন্যা কল্যাণীর দেশচেতনায় ঋদ্ধ ব্যক্তিত্বের জাগরণ ও তার অভিব্যক্তিতে গল্পটি সার্থক। ‘অপরিচিতা’ উত্তম পুরুষের জবানিতে লেখা গল্প। গল্পের কথক অনুপম বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের যুদ্ধ সংলগ্ন সময়ের সেই বাঙালি যুবক, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধি অর্জন করেও ব্যক্তিত্বরহিত, পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় পুতুলমাত্র। তাকে দেখলে আজো মনে হয়, সে যেন মায়ের কোলসংলগ্ন শিশুমাত্র। তারই বিয়ে উপলক্ষে যৌতুক নিয়ে নারীর চরম অবমাননাকালে শম্ভুনাথ সেনের কন্যা-সম্প্রদানে অসম্মতি গল্পটির শীর্ষ মুহূর্ত। অনুপম নিজের গল্প বলতে গিয়ে ব্যাঙ্গার্থে জানিয়ে দিয়েছে সেই অঘটন সংঘটনের কথাটি। বিয়ের লগ্ন যখন প্রস্তুত তখন কন্যার লগ্নভ্রষ্ট হওয়ার লৌকিকতাকে অগ্রাহ্য করে শম্ভুনাথ সেনের নির্বিকার অথচ বলিষ্ঠ প্রত্যাখ্যান নতুন এক সময়ের আশু আবির্ভাবকেই সংকেতবহ করে তুলেছে। কর্মীর ভূমিকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জাগরণের মধ্য দিয়ে গল্পের শেষাংশে কল্যাণীর শুচিশুভ্র আত্মপ্রকাশও ভবিষ্যতের নতুন নারীর আগমনীর ইঙ্গিতে পরিসমাপ্ত। ‘অপরিচিতা’ মনস্তাপে ভেঙেপড়া এক ব্যক্তিত্বহীন যুবকের স্বীকারোক্তির গল্প, তার পাপস্খালনের অকপট কথামালা। অনুপমের

আত্মবিবৃতির সূত্র ধরেই গল্পের নারী কল্যাণী অসামান্যা হয়ে উঠেছে। গল্পটিতে পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতার স্ফুরণ যেমন ঘটেছে, তেমনি একই সঙ্গে পুরুষের ভাষ্যে নারীর প্রশস্তিও কীর্তিত হয়েছে।

চাষার দুক্ষু

রোকেয়া সাখাওয়াত হেসেন

লেখক পরিচিতি

রোকেয়া সাখাওয়াত হেসেন ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার অর্ন্তগত পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জহিরউদ্দীন আবু আলী হায়দার সাবের এবং মাতা রাহাতুন্নেসা চৌধুরী। তাঁর প্রকৃত নাম রোকেয়া খাতুন এবং বৈবাবিক সূত্রে নাম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। রোকেয়ার পিতা বহু ভাষায় সুপণ্ডিত হলেও মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে ছিলেন রক্ষণশীল। বড় ভাইবোনের সহচর্যে রোকেয়া বাংলা ও ইংরেজি ভাষা ভালোভাবেই রপ্ত করেন এবং জ্ঞানার্জনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। ষোলো বছর বয়সে উর্দুভাষী ও বিপত্নীক সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে (১৮৯৮) তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ডেপুটি

ম্যাজিস্ট্রেট স্বামীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় তাঁর জ্ঞানার্জনের পথ সুগম হয়। বিরুপ সমালোচনা ও নানাবিধি প্রতিবন্ধকতার মুখেও তিনি কখনোই নারীশিক্ষার লক্ষ থেকে সরে আসেননি, বরং পর্দাপ্রথা ও শিক্ষাবিমুখ মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার জন্য বাড়িতে বাড়িতে ছাত্রী সংগ্রহ করেছেন। রোকেয়া বাংলা গদ্যের বিশিষ্ট শিল্পি। সমাজের কুসংস্কার ও জড়তা দূর করার জন্য তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্বপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী গদ্য রচনা করেন। তাঁর সব রচনাই সমাজ জীবনের গভীর উপলব্ধি থেকে উৎসারিত। ‘মতিচুর’ ও ‘অবোরোধবাসিনী’ তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ গদ্যগ্রন্থ। এছাড়া ‘সুলতানার স্বপ্ন’ ও ‘পদ্মরাগ’ নামে দুটি উপন্যাসও তিনি রচনা করেন।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর এই মহীয়সী নারীর জীবনাবাসন ঘটে।

.

মূলরচনা

ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরি রে ভাই

পাছায় জোটে না ত্যানা।

বৌ এর পৈছা বিকায় তবু

ছেইলা পায় না দানা।

শুনিতে পাই, দেড় শত বছর পূর্বে ভারতবাসী অসভ্য বর্বর ছিল। এই দেড়শত বছর হইতে আমরা ক্রমশ সভ্য হইতে সভ্যতর হইতেছি। শিক্ষায়, সম্পদে আমরা পৃথিবীর

অন্যান্য দেশে ও জাতির সমকক্ষ হইতে চলিয়াছি। এখন আমাদের সভ্যতা ও ঐশ্বর্য রাখিবার স্থান নাই। সত্যই তো, এই যে অভ্রভেদী পাঁচতলা পাকা বাড়ি, রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, স্টিমার, এরোপ্লেন, মোটর লরি, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, পোস্টঅফিস, চিঠিপত্রের সুনিয়মিত ডেলিভারি, এখানে পাটকল, সেখানে চটকল, অট্টালিকার চূড়ায় বড় বড় ঘড়ি, সামান্য অসুখ হইলে আট দশ জন ডাক্তারে টেপে নারী, চিকিৎসা, ঔষধ, অপারেশন, ব্যবস্থাপত্রের ছড়াছড়ি, থিয়েটার, বায়স্কোপ, ঘৌড়দৌড় জনতার হুড়াহুড়ি লেমলেন্ড জিঞ্জারেন্ড, বরফের গাড়ি, ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান, অনারেবলের গড়াগড়ি (বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের বাড়াবাড়ি)-এসব কি সভ্যতার নিদর্শন নহে? নিশ্চয়! যে বলে 'নহে', সে ডাহা নিমকহারাম।

.

কিন্তু ইহার অপর পৃষ্ঠাও আছে-কেবল কলিকাতাটুকু আমাদের গোটা ভারতবর্ষ নহে এবং মুষ্টিমেয়, সৌভাগ্যশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি সমস্ত ভারতের অধিবাসী নহে। অদ্য আমাদের আলোচ্য বিষয়, চাষার দারিদ্র। চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড। তবে আমার 'ধান ভানিতে শিবের গান' কেন? অবশ্যই ইহার কারন আছে। আমি যদি প্রথমেই পল্লিবাসী কৃষকের দুঃখ-দুর্দশার কান্না কাঁদিতে বসিতাম তবে কেহ চট্ করিয়া আমার চক্ষে আঙুল দিয়া দেখাইতেন যে, আমাদের মোটরকার আছে, গ্রামোফোন আছে ইত্যাদি। ভালোর ভাগ ছাড়িয়া কেবল মন্দের দিকটা দেখা কেন? সেই জন্য ভালোর দিকটা আগে দেখাইলাম। এখন মন্দের দিকে দেখা যাউক।

.

ঐ যে চটকল আর পাটকল;-এক একটা জুট মিলের কর্মচারীগণ মাসিক ৫০০-৭০০ (পাঁচ কিম্বা সাত শত) টাকা বেতন পাইয়া নবাবী হালে থাকে, নবাবী চাল চালে, কিন্তু সেই জুট (পাট) যাহারা উৎপাদন করে তাহাদের অবস্থা এই যে,- 'পাছায় জোটে

না ত্যানা!’ ইহা ভাবিবার বিষয় নহে কি? আল্লাহতালা এত অবিচার কিরুপে সহ্য করিতেছেন?

.

মূলরচনা-২

.

সমগ্র ভারতের বিষয় ছাড়িয়া কেবল বঙ্গদেশের আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে। একটি চাউল পরীক্ষা করিলেই হাড়িভরা ভাতের অবস্থা জানা যায়। আমাদের বঙ্গভূমি সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা,-তবু চাষার উদরে অন্য নাই কেন? ইহার উত্তর শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়াছেন, æধান্য তার বসুন্ধরা যার”। তাইতো অভাগা চাষা কে? সে কেবল æক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরিবে”, হাল বহন করিবে, আর পাট উৎপাদন করিবে। তাহা হইলে চাষার ঘরে যে æমোরাইভরা ধান ছিল, গোয়াল ভরা গরু ছিল, উঠান ভরা মুরগি ছিল”, এ কথার অর্থ কি? এহা কি সুধুই কবির কল্পনা? না, করিব কল্পনা নহে, কাব্য উপন্যাসেও নহে, সত্য কথা। পূর্বে ওসব ছিল এখন নাই। আরে এখন যে আমরা সভ্য হইয়াছি! ইহাই কি সভ্যতা? সভ্যতা কি করিবে, ইউরোপের মহাযুদ্ধ সমস্ত পৃথিবীকে সর্বস্বান্ত করিয়াছে, তা বঙ্গীয় কৃষকের কথা কি?

.

আমি উপযুক্ত উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারি না, কারণ ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ তো এই সাত বৎসরের ঘটনা। ৫০ বৎসর পূর্বেও কি চাষার অবস্থা ভালো ছিল? দুই একটি উদাহরণ দেখাই-বাল্যকালে শুনিতাম, টাকায় আট সের সরিষার তৈল ছিল আর টাকায় ৪ সের ঘৃত। যখন টাকায় ৮ সের সরিষার তৈল ছিল, তখনকার একটা গল্প এই:

.

æকৃষক কন্যা জমিরনের মাথায় বেশ ঘন ও লম্বা চুল ছিল, তার মাথায় প্রায় আধ

পোয়াটাক তেল লাগিত। সেই জন্য যেদিন জমিরণ মাথা ঘষিত, সেইদিন তাহার মা তাকে রাজবাড়ী লইয়া আসিত, আমরা তাকে তেল দিতাম” হা অদৃষ্ট! যখন দুই গণ্ডা পয়সায় এক সের তৈল পওয়া যাইত, তখনও জমিরনের মাতা কণ্যার জন্য এক পয়সার তেল জুটাইতে পারিত না।

.

এই তো ৩০/৩৫ বৎসর পূর্বে বিহার অঞ্চলে দুই সের খেসারি বিনিময়ে কৃষক পত্নী কন্যা বিক্রয় করিত। পঁচিশ বৎসর পূর্বে উড়িষ্যার অন্তর্গত কনিকা রাজ্যের অবস্থা এই ছিল যে, কৃষকেরা ‘পখাল (পান্তা) ভাতের সহিত লবণ ব্যতীত অন্য কোন উপকরনের সংগ্রহ করিতে পারিত না। শুটকি মাছ পরম উপাদেয় ব্যঞ্জন বলিয়া পরিগনিত হইত। তখন সেখানে টাকায় ২৫/২৬ সের চাউল ছিল। সাত ভায়া নামক সমুদ্র-তীরবর্তী গ্রামের লোকেরা পখাল ভাতের সহিত লবণও জুটাইতে পারিত না। তাহারা সমুদ্র জলে চাল ধুইয়া ভাত রাধিয়া খাইত। রংপুর জেলার কোন এক গ্রামের কৃষক এত দরিদ্র যে, টাকায় ২৫ সের চাউল পাওয়া সত্বেও ভাত না পাইয়া লাউ, কুমড়া প্রভৃতি তরকারি ও পাটশাক, লাউশাক ইত্যাদি সিদ্ধ করিয়া খাইত। আর পরিধান করিত কি, শুনিবেন? পুরুষেরা বহু কষ্টে স্ত্রীলোকদের জন্য ৮ হাত কিংবা ৯ হাত কাপড় সংগ্রহ করিয়া দিয়া নিজেরা কৌপিন ধারণ করিত। শীতকালে দিবাভাগে মাঠে মাঠে রৌদ্রে যাপন করিত; রাত্রিকালে শীত অসহ্য বোধ হইলে মাঝে মাঝে উঠিয়া পাটখড়ি জ্বালিয়া আগুন পোহাইত। বিচালি (বা পোয়াল খড়) শয্যায় শয়ন করিত। অথচ এই রংপুর ধান্য ও পাটের জন্য প্রসিদ্ধ। সুতরাং দেখা যায়, ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সহিত চাষার দারিদ্রের সম্পর্ক অল্পই। যখন টাকায় ২৫ সের চাউল ছিল, তখনও তারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই, এখন টাকায় ৩/৪ সের চাউল হওয়ায়ও তাহারা অর্ধানশনে থাকে-

এ কঠোর মহীতে

চাষা এসেছে শুধু সহিতে;

আর মরমের ব্যথা লুকায়ে মরমে

জঠর-অনলে দহিতে।

.

মূলরচনা-৩

.

পঁচিশ, ত্রিশ বৎসর পূর্বের চিত্র তো এই, তবে æমরাই ভরা ধান ছিল, গোয়াল ভরা গরু ছিল, ঢাকা মসলিন কাপড় ছিল” ইত্যাদি কোন সময়ের অবস্থা? মনে হয়, অন্তত শতাধিক বছর পূর্বের অবস্থা। যখন-কৃষক রমণী স্বহস্তে চরকায় সুতা কাটিয়া বাড়িসুদ্ধ সকলের জন্য কাপড় প্রস্তুত করিত। আসাম এবং রংপুর জেলায় একপ্রকার রেশম হয়, স্থানীয় ভাষায় তাহাকে ‘এন্ডি’ বলে। এন্ডি রেশনের পোকা প্রতিপালন ও তাহার গুটি হইতে সুতা কাটা অতি সহজসাধ্য কার্য। এই শিল্প তদ্দেশবাসিনী রমণীদের একচেটিয়া ছিল। তাহারা এ উহার বাড়ি দেখা করিতে যাইবার সময় টেকো হাতে লইয়া সুতা কাটিতে কাটিতে বেড়াইতে যাইত। এন্ডি কাপড় বেশ গরম ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। ইহা ফ্লানেল হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে, অথচ ফ্লানেল অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী। একখানি এন্ডি কাপড় অবাধে ৪০ (চল্লিশ) বৎসর টেকে। ৪/৫ খানি এন্ডি চাদর থাকিলে লেপ, কম্বল, কাঁথা কিছুই প্রয়োজন হয় না। ফলকথা, সেকালে রমণীগণ হাসিয়া খেলিয়া বস্ত্র-সমস্যা পূরণ করিত। সুতরাং তখন চাষা অন্য বস্ত্রের কাঙাল ছিল না। তখন কিন্তু সে অসভ্য বর্বর ছিল। এখন তাহারা সভ্য হইয়াছে, তাই-

.

শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ

.

ঢেকে রাখে টাক্।

.

কিন্তু তাহাদের পেটে নাই ভাত। প্রশ্ন হইতে পারে-সভ্যতার সহিত দারিদ্র বৃদ্ধি হইবার কারণ কি? কারণ-যেহেতু আপাত সুলভ মূলে বিবিধ রঙিন ও মিহি কাপড় পাওয়া যায়, তবে আর চর্কি রকা লইয়া ঘর্ঘও করিবে কেন? বিচিত্র বর্ণের জুট ফ্লানেল থাকিতে বর্ণহীন এন্ডি বস্ত্র ব্যবহার করিবে কেন? পূর্বে পল্লিবাসীগণ ক্ষার প্রস্তুত করিয়া কাপড় কাচিত; এখন তাহাদের কাপড় ধুইবার জন্য হয় ধোপার প্রয়োজন, নয় সোডা। চারি পয়সায় সোডার যে কার্য সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য আর কষ্ট করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে কেন? এইরূপে বিলাসিতা শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে বিষে জর্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে। ঐ যে æপাছায় জোটে না ত্যানা” কিন্তু মাথায় ছাতা এবং সম্ভবত পায়ে জুতা আছে ত! æবৌ-এর পৈছা বিকায়” কিন্তু তবু æবেলোয়ারের চুড়ি” থাকে ত! মুটে মজুর ট্রাম না হইলে দুই পদ নড়িতে পারে না। প্রথম দৃষ্টিতে ট্রামের ভাড়া পাঁচটা পয়সা অতি সামান্য বেধ হয়-কিন্তু ঐ যাঃ, যাইতে আসিতে দশ পয়সা লাগিয়া গেল! এইরূপ দুইটি পয়সা, চারি পয়সা করিয়া ধীরে ধীরে সর্বস্বহারা হইয়া পড়িতেছে।

নিজ অন্ন পর কর পণ্যে দিলে,

পরিবর্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে!

বিলাসিতা ওরফে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ‘অণুকরণপ্রিয়তা’ নামক আরেকটা ভূত তাহাদের স্কন্ধে চাপিয়া আছে। তাহাদের আর্থিক অবস্থা সামান্য একটু সচ্ছল হইলেই তাহারা প্রতিবেশী বড়লোকদের অনুকরণ করিয়া থাকে। তখন চাষার বৌ-ঝির

যাতায়াতের জন্য সওয়ারি চাই; ধান ভানাবার জন্য ভারানি চাই, ইত্যাদি। এইরুপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে:

সর্ব অঙ্গেই ব্যথা,

ঔষধ দিব কোথা?

আর-

এ বহ্নির শত শিখা

কে করিবে গণনা?

.

মূলরচনা-৪

.

অতঃপর শিবিকাবাহকগণ পাল্কি লইয়া ট্রামে যাতায়াত করিলেই সভ্যতার চূড়ান্ত হইবে।আবার মজা দেখুন, আমরা তো সুসভ্য হইয়া এন্ডি কাপড় পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু ঐ এন্ডি কাপড়ই 'আসাম সিল্ক নামে অভিহিত হইয়া কোট, প্যান্ট ও স্কার্ট রুপে ইউরোপীয় নর-নারীদের বর-অঙ্গে শোভা পাইতে লাগিল! ক্রমে পল্লিবাসিনীর সভ্যতার মাত্রাধিক্য হওয়ায় (অথার্থ আর এন্ডি পোকা প্রতিপালন করা হয় না বলিয়া) এখন আর 'হোয়াইট এ্যাওয়ে লেডল'র দোকানে 'আসাম সিল্ক' পাওয়া যায় না। কেবল ইহাই নহে, আসাম হইতে এন্ডি গুটি বিদেশে চালান যায়-তথা হইতে সূত্র রুপে আবার আসামে ফিরিয়া আইসে। এ তো সেদিনের কথা,-বঙ্গের গভর্নরও লর্ড কারমাইকেল একখানি দেশি রেশমি রুমালের জন্মস্থান অনুসন্ধান করেন, কেহই বলিতে পারিল না সেরুপ রুমাল কোথায় প্রস্তুত হয়। কিন্তু লর্ড কারমাইকেল ইংরেজ বাচ্চা-সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনি রুমালটার জন্মভূমি আবিষ্কার করিয়া

ফেলিলেন। পূর্বে মুর্শিদাবাদের কোন গ্রামে ঐরূপ রেশমি রুমাল প্রস্তুত হইত, এখন আর হয় না, কারণ সে গ্রামের লোকেরা সুসভ্য হইয়াছে! ফল কথা, সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশি শিল্পসমূহ ক্রমশ বিলুপ্ত হইয়াছে।

.

সুখের বিষয়, সম্প্রতি পল্লিগ্রামের দুর্গতির প্রতি দেশবন্ধু নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কেবল দৃষ্টিপাতেই যথেষ্ট নহে, চাষার দুঃক্ষু যাহাতে দূর হয়, সেজন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ চেষ্টা যত্ন করিতে হইবে। আবার সেই æমরাইভরা ধান, ঢাকা মসলিন” ইত্যাদি লাভ করিবার একমাত্র উপায় দেশি শিল্প-বিশেষত নারী শিল্পসমূহের পুনরুদ্ধার। জেলায় জেলায় পাটের চাষ কম করিয়া তৎপরিবর্তে কার্পাসের চাষ প্রচুর পরিমাণে হওয়া চাই এবং চরকা ও এন্ডি সুতার প্রচলন বহুল পরিমাণে হওয়া বাঞ্চনীয়। আসাম এবং রংপুর বাসিনী ললনাগন এন্ডি পোকা প্রতিপালনে তৎপর হইলে সমগ্র বঙ্গদেশের বস্ত্রক্লেশ লাঘব হইবে। পল্লিগ্রামে সুশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হওয়া চাই। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা আর ঘরে ঘরে চরকা ও টেকো হইলে চাষার দারিদ্র ঘুচিবে।

শব্দার্থ ও টীকা
=============

[illegible] ছেইলা-ছেলে। সন্তান সন্ততি অর্থে।

[illegible] পৈছা-স্ত্রীলোকদের মণিবন্ধনের প্রাচীন অলঙ্কার।

[illegible] দানা-খাদ্য অর্থে। ছোলা, মটর, কলাই-এইসব শস্যকেও দানা বলে।

[illegible] অভ্রভেদী-অভ্র অর্থ আকাশ বা মেঘ ভেদকারী। আকাশচুম্বী।

[illegible] ট্রামওয়ে-ট্রাম চলাচলের রাস্তা। রেলওয়ের মত রাস্তা দিয়ে ট্রাম চলে তবে তা অধিকতর হালকা।

বাস চলাচলের রাস্তার ভিতরেও ট্রামওয়ে থাকতে পারে।

[illegible] বায়স্কোপ-চলচ্চিত্র, ছায়াছবি, সিনেমা।

[illegible] চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড-বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। সুপ্রাচীন কাল থেকে অন্য কুটির শিল্পের মতো

সামান্য বৃত্তি থাকলেও কৃষিই এদেশের মনুষের জীবনযাপনের প্রধান বৃত্তি। এমন কি বিশ শতকে পৃথিবীর কিছু দেশ যখন শিল্পে আসাধারণ সমৃদ্ধি লাভ করেছে আমাদের দেশ তখনও কৃষি বিকাশকেই সবচেয়ে প্রাধান্য দিয়েছে। সুতরাং কৃষি যে এদেশের মেরুদণ্ড-এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

[illegible] পাছায় জোটে না ত্যানা-পাট উৎপাদনকারী কৃষকদের চরম দারিদ্রের পরিচয় দিতে গিয়ে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনই প্রবাদটি ব্যবহার করেছেন। চটকল প্রতিষ্ঠার পর পাটের চাহিদা ও কদর বেড়ে যায়। পাটকল শ্রমিকগণ পর্যাপ্ত মাসোহারা স্বাচ্ছন্দে জীবনযাপন করতে থাকেন। কিন্তু যারা পাট উৎপাদন করতেন সেই কৃষকদের অবস্থা ছিল মানবেতর। দারিদ্রের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে তাদের জীবন শেষ হতো। প্রবাদটির ভিতর দিয়ে কৃষকদের সেই করুণ অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

[illegible] কৌপিন-ল্যাঙ্গট। চীরবসন। লজ্জা নিবারনের জন্য পরিধেয় সামান্য বস্ত্র।

[illegible] মহীতে-পৃথিবীতে।

[illegible] টোকা-সুতা পাকাবার যন্ত্র।

[illegible] এন্ডি-মোটা রেশমি কাপড়।

[illegible] বেলোয়ারের চুড়ি-উৎকৃষ্ট স্বচ্ছ কাচে প্রস্তুত চুড়ি।

-

পাঠ পরিচিতি

=============

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত ‘চাষার দুক্ষু’ শীর্ষক রচনাটি বাংলা একাডেমি প্রকাশিত æরোকেয়া রচনাবলি” থেকে চয়ন করা হয়েছে। তাঁর শিক্ষা ও সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে লেখালেখির জগৎ উৎসর্গীকৃত হয়েছে পশ্চাৎপদ নারীসমাজের মুক্তি ও সমৃদ্ধির জন্য। কিন্তু ‘চাষার দুক্ষু’ শীর্ষক প্রবন্ধটি তৎকালীন দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকদের বঞ্চনার মর্মন্তুদ দলিল হয়ে আছে। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও অগ্রগতির ফিরিস্তি তুলে ধরে তিনি দেখিয়েছেন, সেখানে কৃষকদের অবস্থা কত শোচনীয়। পাকা বাড়ি, রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, স্টিমার, এরোপ্লেন, মোটর গাড়ি, টেলিফোন, টেলিগ্রাফসহ আরও যে কত আবিষ্কার ভারতবর্ষের শহুরে মানুষের জীবন সমৃদ্ধ ও সচ্ছল করে তুলেছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সেই ভারতবর্ষেই কৃষকদের পেটে খাদ্য জোটে না, শীতে বস্ত্র নেই, অসুখে চিকিৎসা নেই। এমনকি তাদের পান্তাভাতে লবণও জোটে না। সমুদ্র তীরবর্তী লোকেরা সমুদ্রজলে চাল ধুইয়ে

লবণের অভাব মেটানোর চেষ্টা করে। টাকায় পঁচিশ সের চাল মিললেও রংপুরের কৃষকগণ চাল কিনতে না পেরে লাউ, কুমড়া, পাট শাক, লাউ শাক সিদ্ধ করে খেয়ে জঠর-যন্ত্রণা নিবারণ করে। কৃষকদের এই চরম দারিদ্র্যের জন্য তিনি সভ্যতার নামে এক শ্রেণির মানুষের বিলাসিতাকে দায়ী করেছেন। আবার কোনো কোনো কৃষককেও এই বিলাসিতার বিষে আক্রান্ত করেছে। এছাড়া গ্রামীণ কুটির শিল্পের বিপর্যয়ও কৃষকদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। কুটির শিল্পকে ধ্বংস করে দিয়ে আত্মনির্ভরশীল গ্রাম-সমাজকে চরম সংকটের মধ্যে ফেলেছে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী। কৃষকদের এই মুমূর্ষু অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন গ্রামে গ্রামে পাঠশালা প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। আর গ্রামীণ কুটির শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখারও পরামর্শ দিয়েছেন। এই প্রবন্ধে রোকেয়ার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, যুক্তিশীলতা ও চিন্তার বিস্ময়কর অগ্রসরতার প্রতিফলন ঘটেছে।

আহ্বান

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার মুরারিপুর গ্রামে মামাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃনিবাস একই জেলায় ব্যাকপুর গ্রামে। বিভূতিভূষণের বাল্য ও কৈশোরকাল কাটে অত্যন্ত দারিদ্রে। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। ১৯১৪ সালে ম্যাট্রিক ও ১৯১৬ সালে আইএ -উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে এবং ১৯১৮ সালে ডিস্টিংশনসহ বিএ পাস করেন। তিনি দীর্ঘদিন স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন এবং এর পাশাপাশি শহর থেকে দূরে অবস্থান করে নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যসাধনা করেছেন। বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের জীবনকে তিনি তাঁর অসাধারণ শিল্পসুষমায় ভাষা সাহজিক সারল্যে প্রকাশ করেছেন। মানুষকে তিনি দেখেছেন গভীর ও নিবিড় ভালোবাসা দিয়ে। তাঁর গদ্য কাব্যময় ও চিত্রাত্মক বর্ণনাসমৃদ্ধ।

.

বিভূতিভূষণের কালজয়ী যুগল উপন্যাস: পথের পাঁচালী ও অপরাজিতা। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : ‘দৃষ্টি প্রদীপ’, ‘আরণ্যক’, ‘দেবযান’, ও ‘ইছামতি’, গল্পগ্রন্থ ‘মেঘমল্লার’, মৌরিফুল’, ‘যাত্রাবদল’ ও ‘কিন্নরদল’।

বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫০ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর ঘাটশিলায় মৃত্যুবরণ করেন।

.

মূলরচনা-১

দেশের ঘরবাড়ি নেই অনেকদিন থেকেই। পৈত্রিক বাড়ি যা ছিল ভেঙেচুরে ভিটিতে জঙ্গল গজিয়েছে। এ অবস্থায় একদিন গিয়েছি দেশে কিসের একটা ছুটিতে। গ্রামের চক্কোত্তি মশায় আমার বাবার পুরাতন বন্ধু। আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। বললেন- কতকাল পরে বাবা মনে পড়ল দেশের কথা? প্রণাম করে পায়ের ধুলা নিলাম্ বললেন-এসো, এসো, বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও। বাড়িঘর করবে না?

-আজ্ঞে সামান্য মাইনে পাই-

-তাতে কী? গ্রামের ছেলে গ্রামের বাস করবে, এতে আর সামান্য মাইনে বেশি মাইনে কী? আমি খড় বাঁশ দিচ্ছি, চালাঘর তুলে ফেল, মাঝে মাঝে যাতায়াত করো।

আরও অনেক এসে ধরল, অন্তত খড়ের ঘর ওঠাতে হবে। অনেকদিন পরে গ্রামে এসে লাগছে ভালোই। বড় আমবাগানের মধ্য দিয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছি, আমগাছের ছায়ায় একটি বৃদ্ধার চেহারা, ডান হাতে নড়ি ঠকঠক করতে করতে-বোধ হয় বাজারের দিকে চলেছে।

বুড়িকে দেখেই আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাবে?

বুড়ি আমায় ভালো না দেখতে পেয়ে কিংবা চিনতে পেরে ডান হাত উঁচিয়ে তালু আড়ভাবে চোখের ওপর ধরল। বলল, কে বাবা, তুমি? চেনলাম না তো?

-চিনবে না। আমি অনেক দিন গাঁয়ে আসি নি।

-তা হবে বাবা।আমি তো এপাড়া-ওপাড়া যাতাম আসতাম না। তিনি থাকতি অভাব ছিল না কোনো জিনিসের। গোলাভরা ধান, গোয়ালপোরা গরু।

-তোমাকে তো চিনতে পারলাম না, বুড়ি?

-আমার তো তেনার নাম করতেন নেই বাবা। করাতের কাজ করতেন।

বললাম তো তোমার ছেলে আছে?

কেউ নেই বাবা, কেউ নেই। এক নাম জামাই আছে তো সে মোরে ভাত দেয় না। আমার বড্ড কষ্ট। ভাত জোটে না সবদিন।

ব্যাপারটা এখানে চুকে যাবে ভেবেছিলাম। কিন্তু তা চুকল না।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেছি, এমন সময় সেই বুড়ি লাঠি ঠক্‌ঠক্ করতে করতে হাজির উঠোনে। থাকি এক জ্ঞাতি খুড়োর বাড়ি। তিনি বললেন, ও হলো জমির করাতির স্ত্রী। অনেকদিন আগে মরে গিয়েছে জমির।

.

মূলরচনা-২

.

বুড়ি উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকল, ও বাবা। বোধহয় একটু চোখে কম দেখে। বললাম, এইযে এখানে। আমার খুড়োমশায় বুড়িকে বুঝিয়ে দিলেন আমি কে। সে উঠোনের কাঁঠালতলায় বসে আপন মনে খুব খানিকটা বকে গেল।

.

পরদিন কলকাতা চলে গেলাম, ছুটি ফুরিয়ে গেল। কয়েক মাস পরে জ্যৈষ্ঠ মাসে গরমের ছুটিতে আমার নতুন তৈরি খড়ের ঘরখানাতে এসে উঠলাম। কলকাতাতে কর্মব্যস্ত ক'মাসের মধ্যে বুড়িকে একবারও মনে পড়েনি বা এখানে এসেও মনে হঠাৎ হয়ত হতো না, যদি সে তার পরের দিন সকালে আমার ঘরের নিচু দাওয়ায় এসে না বসে পড়ত। বললাম, কী বুড়ি, ভালো আছো? ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের প্রান্ত থেকে গোটাকতক আম খুলে আমার সামনে মাটিতে রেখে বলল, আমার কি মরণ আছে রে

বাবা। জিজ্ঞাসা করলমা, ও আম কীসের। দন্তহীন মুখে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, অ গোপাল আমার, তোর জন্যি নিয়ে আলাম। গাছের আম বেশ কড়া মিষ্টি, খেয়ে দেখ এখন। বড় ভালো লাগল। গ্রামে অনেকদিন থেকে আপনার জন কেউ নেই। একটা ঘনিষ্ট আদরের সম্বোধন করার লোকের দেখা পাই নি বাল্যকালে মা-পিসিমা মারা যাওয়ার পর থেকে। বুড়ি বললে, থাও কোথায় হ্যাঁ বাবা? খুড়ো মশায়ের বাড়ি। বেশ যত্ন করে তো ওনারা? তা করে। দুধ পাচ্ছ ভালো? ঘুঁটি গোয়ালিনী, দেয় মন্দ না। ও বাবা, ওর দুধ! অর্ধেক জল-দুধ খেতি পাচ্ছ না ভালো সে বুঝেচি।

.

পরদিন সকাল হয়েছে, বুড়ি দেখি উঠোনে এসে ডাকছে, অ গোপাল। বিছানা ছেড়ে উঠে বললাম, আরে এত সকালে কী মনে করে। হাতে কী? বৃদ্ধা হাতের নড়ি আমার দাওয়ার গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে বলল, এক ঘটি দুধ আনলাম তোর জন্যি। সে কী! দুধ পেলে কোথায় এত সকালে? আমার মা বলে ডাকে ওই হাজরা ব্যাটার বউ। মোর চালাঘরের পাশে ওর চালাঘর। ওরে কাল রাত্তিরে বলে রেখে দিয়েছিলাম, বলি বউ আমার, গোপাল দুধ খেতি পায় না। তাই আজ ভোরে উঠে দেখি আমারে ডাকচে, মা ওঠো, তোমার গোপালের জন্যি দুধ নিয়ে যাও।

.

-আচ্ছা কেন বলতো তোমার এসব! আর কখনও এনো না। কত পয়সা দাম দিতে হবে বল। কতটা দুধ? বুড়ি একটু ঘাবড়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বলে, কেন বাবা পয়সা কেন? পয়সা না তো তুমি দুধ পাবে কোথায়? ওই যে, বললাম বাবা, আমার মেয়ের বাড়ি থেকে। তা হোক, তুমি পয়সা নিয়ে যায়। সেও তো গরিব লোক। বুড়ি পয়সা নিয়ে চলে গেল বটে কিন্তু সে যে দমে গিয়েছি তার কথাবার্তার ধরনে বেশ বুঝতে

পারলাম। মনে একটু কষ্ট হলো বুড়ি চলে গেলে। পয়সা দিতে যাওয়া ঠিক হয়েছে কি? বুড়ি কী রকম হয়ত মন পড়ে গিয়েছে আমার ওপর, স্নেহের দান-এমন করা ঠিক হয়নি। বুড়ি কিন্তু এ অবহেলা গায়ে মাখল না আদৌ। প্রতিদিন সকাল হতে না হতে সে এসে জুটবে।

.

মূলরচনা-৩

.

অ গোপাল, এই দুটি কচি শসার জালি মোর গাছের, এই ন্যাও। নুন দিয়ে খাও দিকিন মোর সামনে? বুড়ি তোমার চলে কীসে? ওই যারে মেয়ে বলি, ও বড্ড ভালো। লোকের ধান ভানে, তাই চাল পায়, আমায় দুটো না দিয়ে খায় না।-একা থাক? তা একদিন মোর ঘরখানা না হয় দেখতি গেলে, অ মোর গোপাল! আমি নতুন খাজুর পাতার চেটাই বুনে রেখে দিয়েছিলাম তোমারে বসতি দেবার জন্যি। সেবার বুড়ির বাড়িতে আমার যাওয়া ঘটে উঠল না। কিছু না কিছু আনবেই। কখনো পাকা আম, কখনো পাতি লেবু, কখনো বা একছড়া কাঁচকলা কি এক ফালি কুমড়ো।

.

পুনরায় গ্রামে এলাম পাঁচ-ছয় মাস পরে, আশ্বিন মাসের শেষে। কয়েকদিন পরে ঘরে বসে আছে, বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে কে যেন জিজ্ঞাসা করলে, বাবু ঘরে আছেন গা? বাইরে এসে দেখি জ্যৈষ্ঠ মাসে যাকে বুড়ির সঙ্গে দেখেছিলাম সেই মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকটি। আমায় দেখে সলজ্জভাবে মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে দেবার চেষ্টা করে সে বললে, বাবু কবে এসেছেন?-দিন পাঁচ-ছয় হলো। কেন? আমার সেই মা পেটিয়ে দিলে, বলে দেখে এসো গিয়ে। কেন? ও সেই বুড়ি-এখানে যিনি আসত। তেনার বড্ড অসুখ। এবার বোধ হয় বাঁচবে না। গোপাল কবে আসবে, গোপাল কবে

আসবে-অস্থির, আমারে রোজ শুধায়। একবার দেখে আসুন, গিয়ে, বড্ড খুশি হবে তাহলি। বিকেলের দিকে বেড়াতে যাবার পথে দেকতে গেলাম বুড়িকে। বুড়ি শুয়ে আছে একটা মাদুরের ওপর, মাথায় মলিন বালিশ, আমি গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই বুড়ি চোখ মেলে আমার দিকে চাইল। পরে আমাকে চিনে ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠবার চেষ্টা করতেই আমি বললাম, উঠো না, ও কী?

.

মূলরচনা-৪

.

বুড়ি আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলল, ভালো আছ অ মোর গোপাল? বসতে দে গোপালকে। বসতে দে। বসবার দরকার নেই থাক। গোপালের ওই খাজুরের চটখানা পেতে দে। পরে ঠিক যেন আপনার মা কি পিসিমার তো অনুযোগের সুরে বলতে লাগল, তোর জন্যি খাজুরের চাটাইখনা কদ্দিন আগে বুনে রেখেলাম। ওখানা পুরনো হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে। তুই একদিনও এলি না গোপাল। অসুখ হয়েছে তাও দেখতে এলি না। বুড়ির দুচোখ বেয়ে জল বেয়ে পড়ছে গড়িয়ে। আমায় বলল, গোপাল, যদি মরি, আমার কাফনের কাপড় তুই কিনে দিস। আসবার সময় বুড়ির পাতানো মেয়েটির হাতে কিছু দিয়ে এলাম পথ্য ও ফলের জন্য। হয়ত আর বেশি দিন বাঁচবে না, এই অসুখ থেকে উঠবে না। বুড়ি কিন্তু সে যাত্রা সেরে উঠল। বছর খানেক আর গ্রামে যাইনি। বোধহয় দেড় বছরও হতে পারে। একবার শরতের ছুটির পর তখনও দুইদিন ছুটি হাতে আছে। গ্রামেই গেলাম এই দুইদিন কাটাতে। গ্রামে ঢুকতেই প্রথমে দেখা পরশু সর্দারের বউ দিগম্বরীর সঙ্গে। দিগম্বরী অবাক হয়ে বলে, ওমা আজই তুমি এলে? সে বুড়ি কাল রাতে মারা গিয়েছে। তোমার নাম করলো বড্ড। ওর সেই পাতানো মেয়ে আজ সকালে বললেন। আমি এসেছি। শুনে বুড়ির নাতজামাই দেখা

করতে এল।

.

আমার মনে পড়ল বুড়ি বলেছিল সেই একদিন-আমি মরে গেলে তুই কাফনের কাপড় কিনে দিস বাবা। ওর স্নেহাতুর আত্মা বহু দূর থেকে আমায় আহ্বান করে এনেছে। আমার মন হয়ত ওর ডাক এবার আর তাচ্ছিল্য করতে পারেনি। কাপড় কিনবার টাকা দিলাম। নাতজামাই বলে গেল, মাটি দেওয়ার সময় একবার যাবেন। বেলা বারোটা আন্দাজ যাবেন। শরতের কটুতিক্ত গন্ধ ওঠা বনঝোপ ও মাকাল-লতা দোলানো একটা প্রাচীন গাছের তলায় বৃদ্ধাকে কবর দেওয়া হচ্ছে। আমি গিয়ে বসলাম। আবদুল, শুকর মিঞা, নসর, আমাদের সঙ্গে পড়ত। আবেদালি, তার ছেলে গনি এরা সকলে গাছের ছায়ায় বসে। প্রবীণ শুকর মিয়া আমায় দেখে বলল, এই যে বাবা, এসো। বুড়ির মাটি দেওয়ার দিন তুমি কনে থেকে এলে, তুমি তো জানতে না? তোমায় যে বড্ড ভালোবাসত বুড়ি। দুজন জোয়ান ছেলে কবর খুড়ছে। কবর দেওয়ার পর সকলে এক এক কোদাল মাটি দিল কবরের উপর। শুকুর মিঞা বলল, দ্যাও বাবা-তুমি দ্যাও। দিলাম এক কোদাল মাটি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠতো, ও মোর গোপাল।

শব্দার্থ ও টীকা

==============

[illegible] চক্কোত্তী : চক্রবর্তী উপাধির সংক্ষিপ্ত রূপ। পূজারী ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ।

[illegible] নড়ি : লাঠি।

[illegible] অন্ধের নড়ি : অসহায়ের একমাত্র অবলম্বন

[illegible] গোলাপোরা : গোলাভরা

[illegible] গেয়ালপোরা : গোয়ালভরা

[illegible] করাতের কাজ : কাঠ চেরাই করা পেশা

[illegible] করাতি : করাত দিয়ে কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করে যে।

[illegible] দাওয়া : রোয়াক। বারান্দা।

পাঠ-পরিচিতি

=============

'আহ্বান' গল্পটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলি থেকে সংকলিত হয়েছে। এটি একটি উদার মানবিক সম্পর্কের গল্প।

মানুষের স্নেহ-মমতা-প্রীতির যে বাঁধন তা ধনসম্পদে নয়, হৃদয়ের নিবিড় আন্তরিকতার স্পর্শেই গড়ে ওঠে। ধনী-দরিদ্রের শ্রেণিবিভাগ ও বৈষম্য, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে যে দূরত্ব সংস্কার ও গোঁড়ামির ফলে গড়ে ওঠে তাও ঘুচে যেতে পারে- নিবিড় স্নেহ ও উদার হৃদয়ের আন্তরিকতা ও মানবীয় দৃষ্টির ফলে দারিদ্র্য-পীড়িত গ্রামের মানুষের সহজ-সরল জীবনধারার প্রতিফলনও এই গল্পের অন্যতম উপজীব্য। এ গল্পে লেখক দুটি ভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও আর্থিক অবস্থানে বেড়েওঠা চরিত্রের মধ্যে সংকীর্ণতা ও সংস্কারমুক্ত মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। গ্রামীণ লোকায়ত প্রান্তিক জীবনধারা শাস্ত্রীয় কঠোরতা থেকে যে অনেকটা মুক্ত সে সত্যও এ গল্পে উন্মোচিত হয়েছে।

আমার পথ

কাজী নজরুল ইসলাম

লেখক পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তিনি ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫এ মে (১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম কাজী ফকির আহমেদ, মায়ের নাম জাহেদা খাতুন।

.

সত্য প্রকাশের দুরন্ত সাহস নিয়ে নজরুল আমৃত সকল অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার, প্রতিবাদী। এজন্য বাংলা সাহিত্যের ‘বিদ্রোহী কবি’ হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত। আবার একই সঙ্গে কোমল দরদি মন নিয়ে ব্যথিত বঞ্চিত মানুষের পাশে থেকেছেন তিনি। এক হাতে বাঁশি আরেক হাতে রণতূর্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন নজরুল; আর এসেই প্রচলিত শিল্পসমূহকে নতুন বিষয় ও নতুন শব্দের বাংলা সাহিত্য ও সংগীতকে করেছেন সমৃদ্ধতর। দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া নজরুলের কর্মজীনও ছিল অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। মসজিদের ইমামতি, লেটোর দলে যোগদান, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে সেনাবাহিনীর বাঙালি পল্টনে যোগদান, রাজনীতি, পত্রিকা, সম্পাদনা কিংবা চলচিত্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়াসহ বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তাঁর

জীবন ছিল পূর্ণ। মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় এই ঋদ্ধ ও সম্ভাবনাময় জীবন আমৃত্যু নির্বাক হয়ে যায়। বাংলাদেশে স্বাধীন হলে নাগরিকত্ব এবং জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়ে অসুস্থ নজরুলকে সসম্মানে এদেশে বরণ করে নেওয়া হয়। এর কিছু কাল পরে মৃত্যু তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাধিস্থ করা হয়।

মূলত কবি হলেও সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও বিচরণ করেছেন। তাঁর রচিত উপন্যাসের মধ্যে 'বাঁধনহারা', 'মৃত্যু-ক্ষুদা', 'কুহেলিকা' এবং গল্পগ্রন্থের মধ্যে 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন', 'শিউলিমালা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'যুগ-বাণী', 'দুর্দিনের যাত্রী', 'রুদ্র-মঙ্গল', 'রাজবন্দির জবানবন্দি' তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ।

.

কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯এ আগস্ট (১২ ই ভাদ্র ১৩৮৩) ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

.

মূলরচনা-১

আমার কর্ণধার আমি। আমার পথ দেখাবে আমার সত্য। আমার যাত্রা-শুরুর আগে আমি সালাম জানাচ্ছি। নমস্কার করছি আমার সত্যকে। যে-পথ আমার সত্যের বিরোধী, সে পথ আর কোনো পথই আমার বিপথ নয়। রাজভয়-লোকভয় কোনো ভয়ই আমার বিপথে নিয়ে যাবে না। আমি যদি সত্যি করে আমর সত্যকে চিনে থাকি, আমার অন্তরে মিথ্যার ভয় না থাকে, তাহলে বাইরের কোনো ভয়ই আমর কিছু করতে পারবে না। যার ভিতরে ভয়, সেই বাইরে ভয় পায়। অতএব যে মিথ্যাকে চেনে, সে মিছামিছি তাকে ভয়ও করে না। যার মনে মিথ্যা, সেই মিথ্যাকে

ভয় করে। নিজেকে চিনলে মানুষের মনে আপনা-আপনি এত বড় একটা জোর আসে যে সে আপন সত্য ছাড়া আর কাউকে কুর্নিশ করে না- অর্থাৎ কেউ তাকে ভয় দেখিয়ে পদানত রাখতে পারে না। এই যে, নিজে চেনা, আপনার সত্যকে আপনার গুরু, পদপ্রদর্শক কান্ডারি বলে জানা, এটা দম্ভ নয়, অহংকার নয়। এটা আত্নকে চেনার সহজ স্বীকারোক্তি। আর যদিও এটাকে কেউ ভুল করে অহংকার বলে মনে করেন, তবু এটা মন্দের ভালো-অর্থাৎ মিথ্যা বিনয়ের চেয়ে অনেক বেশি ভালো। অনেক সময় খুব বেশি বিনয় দেখাতে গিয়ে নিজের সত্যকে অস্বীকার করে ফেলা হয়। ওতে মানুষকে ক্রমেই ছোট করে ফেলে, মাথা নিচু করে আনে। ও রকম বিনয়ের চেয়ে অহংকারের পৌরুষ অনেক-অনেক ভালো।

.

মূলরচনা-২

.

অতএব এই অভিশাপ-রথের সারথির স্পষ্ট কথা বলাটাকে কেউ যেন অহংকার বা স্পর্ধা বলে ভুল না করেন। স্পষ্ট কথা বলার একটা অবিনয় নশ্চিয় থাকে; কিন্তু তাতে কষ্ট পাওয়াটা দুর্বলতা। নিজকে চিনলে, নিজের সত্যকেই নিজের কর্ণধার মনে জানলে নিজের শক্তির ওপর অটুট বিশ্বাস আসে। এই স্বাবলম্বন, এই নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস করতেই শেখাচ্ছিলেন, মহাত্মা গান্ধীজি। কিন্তু আমরা তাঁর কথা বুঝলাম না, æআমি আছি” এই কথা না বলে সবাই বলতে লাগলাম æগান্ধীজি আছেন”। এই পরাবলম্বনই আমাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেললে। একে বলে সবচেয়ে বড় দাসত্ব। অন্তরে যাদের এত গোলামির ভাব, তারা বাইরের গোলামি থেকে অন্য একজন মহাপুরুষকে প্রাণপণ ভক্তি করলেই যদি দেশ উদ্ধার হয়ে যেত, তাহলে এই দেশে এতদিন পরাধীন থাকত না। আত্নকে চেনা নিজের সত্যকে বড় মনে করার

দম্ভ-আর যাই হোক ভণ্ডামি নয়। এ দম্ভ শির উঁচু করে, পুরুষ করে, মনে একটা 'ডোন্ট কেয়ার'-ভাব আনে। আর যাদের এই তথাকথিত দম্ভ আছে, শুধু তারাই অসাধ্য সাধন করতে পারবে।

.

মূলরচনা-৩

.

যার ভিত্তি পচে গেছে, তাকে একদম উপড়ে ফেলে নতুন করে ভিত্তি না গাঁথলে তার ওপর ইমারত যতবার খাড়া করা যাবে, ততবারই তা পড়ে যাবে। দেশের শত্রু, দেশের যা-কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামি, মেকি তা সব দূর করতে প্রয়োজন হবে আগুনের সম্মার্জনা! আমার এমন গুরু কেউ নেই, যার খাতিরে সে আগুন সত্যকে অস্বীকার করে করুক মিথ্যা বা ভণ্ডামিকে প্রশ্রয় দেবে। আমি সে দাসত্ব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমি কোনো দিনই কারু র বাণীকে বেদবাক্য বলে মেনে নেব না, যদি তার সত্যতা প্রাণে তার সাড়া না দেয়। না বুঝে বোঝার ভণ্ডামি করে পাঁচ জনের শ্রদ্ধা গআর প্রশংসা পাবার লোব আমি কোনো দিনই করবা না।

.

ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়। কোনো ভুল করছি বুঝতে পারলেই আমি প্রাণ খুলে তা স্বীকার করে নেব। কিন্তু না বুঝেও নয়, ভয়ে নয়। ভুল করছি বা করেছি বুঝেও শুধু জেদের খাতিরে বা গোঁ বজায় রাখবার জন্যে ভুলটাকে ধরে থাকব না। তাহলে আমার আগুন সেই দিনই নিভে যাবে। একমাত্র মিথ্যার জলই এই শিখাকে নিভাতে পারবে। তাছাড়া কেউ নিভাতে পারবে না।

.

মানুষ ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাকি

কোনোখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা আমার এ পথের অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষ যেখানে প্রাণের মিল, আদত সত্যের মিল, সেখানে ধর্মের বৈষম্য, কোনো হিংসার দুশমনির ভাব আনে না। যার নিজের ধর্মের বিশ্বাস আছে যে, নিজের ধর্মকে সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না। দেশের পক্ষে যা মঙ্গলকর বা সত্য, শুধু তাই লক্ষ করে এই আগুণের ঝান্ডা দুলিয়ে বাহির হলাম্।

শব্দার্থ ও টীকা

==============

কর্ণধার - নেতৃত্ব প্রদানের সামর্থ্য আছে এমন ব্যক্তি

কুর্নিশ - অভিবাদন।। সম্মান প্রদর্শন|

অভিশাপ-রথের সারথি-সমাজের নিয়ম পাল্টাতে গেলে বাধার সম্মুখীন হতে হয়, সমাজরক্ষকদের আক্রমণের শিকার হতে হয়। এ কথা জেনেও নজরুল তাঁর বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি অভিশাপ হয়ে আর্বির্ভূত হয়েছেন। নিজেই বসেছেন রথচালক তথা সারথির আসনে।

মেকি -মিথ্যা। কপট।

সম্মার্জনা-মেজে ঘষে পরিষ্কার করা।

আগুনের ঝান্ডা-অগ্নিপতাকা। আগুনে সব শুদ্ধ করে নিয়ে সত্য পথে ওড়ানো নিশান।

পাঠ-পরিচিতি

=============

প্রবন্ধটি কাজী নজরুল ইসলামের সুবিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ 'রুদ্র-মঙ্গল' থেকে সংকলিত হয়েছে। æআমার পথ" প্রবন্ধে নজরুল এমন এক 'আমি'র আবাহন প্রত্যাশা করেছেন যার পথ সত্যের পথ; সত্য প্রকাশে তিনি নির্ভীক অসংকোচ।

.

তাঁর এই 'আমি' ভাবনা বিন্দুতে সিন্ধুর উচ্ছ্বাস জাগায়। নজরুল প্রতিটি মানুষকে পূর্ণ এক 'আমি'র সীমায় ব্যাপ্ত করতে চেয়েছেন; একই সঙ্গে, এক মানুষকে আরেক মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে 'আমরা' হয়ে উঠতে চেয়েছেন। স্বনির্ধারিত এই জীবন-সংকল্পকে তিনি তাঁর মতো আরও যারা সত্যপথের পথিক হতে আগ্রহী তাদের উদ্দেশে ছড়িয়ে দিতে চান। এই সত্যের উপলব্ধি কবির প্রাণপ্রাচুর্যের উৎসবিন্দু। তিনি তাই অনায়াসে বলতে পারেন, 'আমার কর্ণধার আমি। আমার পথ দেখাবে আমার সত্য'। রুদ্র-তেজে মিথ্যার ভয়কে জয় করে সত্যের আলোয় নিজেকে চিনে নিতে সাহায্য করে নজরুলের এই 'আমি' সত্তা। তাঁর পথনির্দেশক সত্য অবিনয়কে মেনে নিতে পারে কিন্তু অন্যায়কে সহ্য করে না। সমাজ ও সমকাল পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রাবন্ধিক দেখেছেন যে, সুস্পষ্টভাবে নিজের বিশ্বাস আর সত্যকে প্রকাশ করতে না জানলে তৈরি হয় পরনির্ভরতা, আহত হয় আমাদের ব্যক্তিত্ব। নজরুলের কাছে এই ভগ্ন আত্মবিশ্বাসের গ্লানি গ্রহণযোগ্য নয়। এর পরিবর্তে তিনি প্রয়োজনে দাম্ভিক হতে চান; কেননা তাঁর বিশ্বাস-সত্যের দম্ভ যাদের মধ্যে রয়েছে তাদের পক্ষেই কেবল অসাধ্য সাধন করা সম্ভব।

.

নজরুল এই প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, তিনি ভুল করতে রাজি আছেন কিন্তু ভণ্ডামি করতে প্রস্তুত নন। ভুল জেনেও তাকে ঠিক বলে চালিয়ে দেবার কপটতা কিংবা জেদ তাঁর দৃষ্টিতে ভণ্ডামি এই ভুল ব্যক্তির হতে পারে, সমাজের হতে পারে কিংবা হতে পারে কোনো প্রকার বিশ্বাসের। তবে তা যারই হোক আর যেমনই হোক এর থেকে বেরিয়ে আসাই নজরুলের একান্ত প্রত্যাশা। তিনি জানেন, এই বেরিয়ে আসার সম্ভব হলেই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রাণের সম্মিলন ঘটানো সম্ভব হবে। মনুষ্যত্ববোধে জাগ্রত হতে পারলেই ধর্মের সত্য উন্মোচিত হবে, এক ধর্মের সঙ্গে অপর ধর্মের বিরোধ মিটে যাবে। সম্ভব হবে গোটা মানব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা; আর এই ঐক্যের মূল শক্তি হলো সম্প্রীতি।

জীবন ও বৃক্ষ

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

লেখক পরিচিতি

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর জন্ম ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুরে। তিনি স্বরণীয় হয়ে আছেন 'বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলন' নামে পরিচিত বাঙ্গালি মুসলমান সমাজের অগ্রগতির এক যুগান্তকারী আন্দোলনের অন্যতম কান্ডারি হিসেবে। সাহিত্যের অঙ্গনে ও বাস্তব জীবনে উভয় ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সৌন্দর্যবোধ, মুক্তবুদ্ধি-চেতনার ও মানব প্রেমের আদর্শের অনুসারী। তিনি ছিলেন আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন, কাজী মোতাহের হোসেন, আবুল ফজল, আবদুল কাদির, প্রমুখের সহযোগী। মননশীল, চিন্তা-উদ্দীপক ও পরিশীলিত গদ্যের রচিয়িতা হিসেবে বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট হয়ে আছেন। তাঁর গ্রন্থ 'সংস্কৃতির কথা' বাংলাদেশের প্রবন্ধ-সাহিত্যে এক বিশিষ্ট সংযোজন। তাঁর প্রকাশিত অন্য দুটি গ্রন্থ হচ্ছে ক্লাইভ বেল-এর 'Civilization' গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত 'সভ্যতা' এবং বারট্রান্ড রাসেলের 'Conquest of Happiness' গ্রন্থের অনুবাদ 'সুখ'। বাংলা একাডেমি তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সমস্ত রচনাবলি-আকারে প্রকাশ করেছে।

.

চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যাপনাকালে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই সেপ্টম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

.

মূলরচনা-১

সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা,

বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া। স্বল্পপ্রাণ স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়, অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অহংকার। তারই চরণে তারা নিবেদিতপ্রাণ। ব্যক্তিগত অহংকার, পারিবারিক অহংকার, জাতিগত অহংকার-এ সবের নিশান ওড়ানোই এদের কাজ। মাঝে মাঝে মানবপ্রেমের কথাও তারা বলে। কিন্তু তাতে নেশা ধরে না, মনে হয় আন্তরিকতাশূন্য, উপলব্ধিহীন বুলি।

.

এদের স্থানে এনে দিতে হবে বড় মানুষের সূক্ষ্মবুদ্ধি উদারহৃদয় গভীরচিত্ত ব্যক্তি, যাদের কাছে বড় হয়ে উঠবে জীবনের বিকাশ, কেবল টিকে থাকা নয়। তাদের কাছে জীবনাদর্শের প্রতীক হবে প্রাণহীন ছাঁচ বা কাল নয়, সজীব বৃক্ষ-যার বৃদ্ধি আছে, গতি আছে, বিকাশ আছে, ফুলে ফলে পরিপূর্ণ। হয়ে অপরের সেবার জন্য প্রস্তুত হওয়া যার কাজ। বৃক্ষের জীবনের গতি ও বিকাশকে উপলব্ধি করা দরকার, নইলে সার্থকতা ও পরিপূর্ণতার ছবি চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে না।

.

বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলদ্ধি সহজ হয়। তাই, বারবার সেদিকে তাকানো প্রয়োজন। মাটির রস টেনে নিয়ে নিজেকে মোটাসোটা করে তোলাতেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি নয়। তাকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরতে হয়। নইলে তার জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই বৃক্ষকে সার্থকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সজীবতা ও সার্থকতার এমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর নেই।

.

মূলরচনা-২

.

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ অন্য কথা বলেছেন। ফুলের মোটা আর নদীর গতির সঙ্গে তুলনা করে তিনি নদীর গতির মধ্যেই মনুষ্যত্বের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। তাঁর মনে মনুষ্যত্বের বেদনা নদীর গতিতেই উপলব্ধ হয়, ফুলের ফোটায় নয়। ফলের ফোটা সহজ, নদীর গতি সহজ নয়-তাকে অনেক বাধা ডিঙানোর দুঃখ পেতে হয়। কিন্তু ফুলের ফোটার দিকে না তাকিয়ে বৃক্ষের ফুল ফোটানোর দিকে তাকালে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ ভালো করতেন। তপোবন-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ কেন যে তা করলেন না বোঝা মুশকিল।

.

জানি, বলা হবে: নদীর গতিতে মনুষ্যত্বের দুঃখ যতটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বৃক্ষের ফুল ফোটানোয় তা তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। তাই কবি নদীকেই মনুষ্যত্বের প্রতীক করতে চেয়েছেন।

.

উত্তরে বলব: চর্মচক্ষুকে বড় না করে কল্পনা ও অনুভূতির চক্ষুকে বড় করে তুললে বৃক্ষের বেদনাও সহজে উপলব্ধি করা যায়। আর বৃক্ষের সাধনায় যেমন একটা ধীরস্থির ভাব দেখতে পাওয়া যায়, মানুষের সাধনা তেমনি একটা ধীরস্থির ভাব দেখতে পাওয়া যায়, আর এটাই হওয়া উচিত নয় কি? অনবরত ধেয়ে চলা মানুষের সাধনা হওয়া উচিত নয়। যাকে বলা হয় গোপন ও নীরব সাধনা তা বৃক্ষেই অভিব্যক্তি, নদীতে নয়। তাছাড়া বৃক্ষের সার্থকতার ছবি যত সহজে উপলব্ধি করতে পারি, নদীর সার্থকতার ছবি তত সহজে উপলব্ধি করা যায় না। নদী সাগরে পতিত হয় সত্য, কিন্তু তার ছবি আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই না। বৃক্ষের ফুল ও ফল ধরানোর ছবি কিন্তু প্রত্যহ চোখে পড়ে। দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সে অনবরত নতি, শান্তি

ও সেবার বাণী প্রচার করে।

.

সাধনার ব্যাপারে প্রাপ্তি একটা বড় জিনিস। নদীর ব্যাপার সাগরে পতিত হওয়ায় সেই প্রাপ্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। সে তো প্রাপ্তি নয়, আত্মবিসর্জন। অপরপক্ষে বৃক্ষের প্রাপ্তি চোখের সামনে ছবি হয়ে ফুটে ওঠে। ফুলে ফলে যখন সে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন আপনা থেকেই বলতে ইচ্ছা হয় এই তো সোধনার সার্থকতা। বৃক্ষে প্রাপ্তি ও দান। সৃজনশীল মানুষেরও প্রাপ্তি ও দানে পার্থক্য দেখা যায় না। যা তার প্রাপ্তি তাই তার দান।

.

মূলরচনা-৩

.

বৃক্ষের পানে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অন্তরের সৃষ্টিধর্ম উপলব্ধি করছেন। বহু কবিতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু গদ্যে তিনি তা স্পষ্ট করে বলেননি। বললে ভালো হতো। তাহলে নিজের ঘরের কাছেই যে সার্থকতার প্রতীক রয়েছে, সে সম্বন্ধে আমরা সচেতন হতে পারতাম।

.

নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধির ওপর ধর্মের মানেও তাই। প্রকৃতির যে মানুষের সে ধর্ম; পার্থক্য কেবল তরুলতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধির ওপর তাদের নিজেদের কোনো হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির ওপরে তার নিজের হাত রয়েছে। আর এখানেই মানুষের মর্যাদা। মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও। মানুষকে আত্মা সৃষ্টি করে নিতে হয়, তা তৈরি পাওয়া যায় না। সুখ-দুঃখ

বেদনা উপলব্ধির ফলে অন্তরের যে পরিপক্কতা, তাই তো আত্মা। এই আত্মারূপ ফল স্রষ্টার উপভোগ্য। তাই মহাকবির মুখে শুনতে পাওয়া যায়। Repeness is all-পরিপক্কতাই সব আত্মাকে মধুর ও পুষ্ট করে গড়ে তুলতে হবে। নইলে তা স্রষ্টার উপভোগের উপভোগের উপযুক্ত হবে না। বিচিত্র অভিজ্ঞতা, প্রচুর প্রেম ও গভীর অনুভূতির দ্বারা আত্মার পরিপুষ্টি ও মার্ধর্য সম্পাদন সম্ভব। তাই তাদের সাধনাই মানুষের শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু। বস্তুজিজ্ঞাসা তথা বিজ্ঞান কখনো শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে না। কেননা, তাতে আত্মার উন্নতি হয় না-জীবনবোধ ও মুল্যবোধে অন্তর পরিপূর্ণ হয় না; তা হয় সাহিত্য-শিল্পকলার দ্বারা। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের এত মূল্য।

.

ওপরের যে বৃদ্ধির কথা বলা হলো বৃক্ষের জীবন তার চমৎকার নিদর্শন। বৃক্ষের অঙ্কুরিত হওয়া থেকে ফলবান হওয়া পর্যন্ত সেখানে কেবলই বৃদ্ধির ইতিহাস। বৃক্ষের পানে তাকিয়ে আমরা লাভবান হতে পারি-জীবনের গূঢ় অর্থ সম্বন্ধে সচেতন হতে পার বলে।

.

বৃক্ষ যে কেবল বৃদ্ধির ইশারা তা নয়-প্রশান্তিরও ইঙ্গিত। অতি শান্ত ও সহিষ্ণুতায় সে জীবনের গুরুভার বহন করে।

শব্দার্থ ও টীকা

===============

[illegible] স্থূলবুদ্ধি- সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধিহীন। অগভীর জ্ঞানসম্পন্ন।

[illegible] জবরদস্তিপ্রিয়- গায়ের জোরে কাজ হাসিলে তৎপর। বিচার বিবেচনাহীন।

[illegible] বিকৃতবুদ্ধি- বুদ্ধির বিকার ঘটেছে এমন। যথাযথ চিন্তাচেতনাহীন।

[illegible] এদের প্রধান দেবতা অহংকার -যথযথ বিচার-বিবেচনাহীন লোকেরা এত গর্বোদ্ধত হয়ে থাকে যে মনে হয় যেন অহংকারই তাদের প্রধান উপাস্য বা দেবতা।

[illegible] বুলি- এখানে গৎ-বাঁধা কথা হিসেবে ব্যবহৃত। যথাযথ অর্থ বহন করে না এমন কথা যা অভ্যাসের বশে বলা হয়ে থাকে।

[illegible] জীবনাদর্শ - জীবনে অনুকরণে উপযুক্ত মহৎ ও শ্রেষ্ঠ দিকগুলো।

[illegible] মনুষ্যত্ব - মানবোচিত সদগুণাবলি। মানুষের বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য।

[illegible] তবোপণ-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ -প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের মতো রবীন্দ্রনাথও ছিলেন অরণ্য ও বৃক্ষপ্রেমিক। তাঁর অনেক কবিতায় বৃক্ষের বন্দনা স্পষ্ট।

[illegible] তপোবন - অরণ্যেৎ ঋষির আশ্রম। মুনি ঋষিরা তপস্যা করে এমন বন।

[illegible] চর্মচক্ষু - দৈহিক চক্ষু। [মানসিক বা দিব্যদৃষ্টির বিপরীত]

[illegible] অনুভূতির চক্ষু-মনের চোখ। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভূতির বা উপলব্ধির ক্ষমতা, সংবেদনশীলতা।

[illegible] নতি - অবনত ভাব। বিনয়, নম্রতা।

[illegible] সাধনা - সাফল্য বা সিদ্ধি অর্জনের জন্য নিরন্তন প্রচেষ্টা।

[illegible] বৃক্ষের প্রাপ্তি ও দান - বৃক্ষের অর্জন হচ্ছে তার ফুল ও ফল। এগুলো সে অন্যের হাতে তুলে দেয়। ফলে বৃক্ষে যুগপৎ প্রাপ্তি ও দানের আদর্শ।

[illegible] সৃজনশীল -নির্মাণ সৃষ্টি তৎপর।

[illegible] সৃষ্টিধর্ম - সৃষ্টি বা সৃজনের বৈশিষ্ট্য।

[illegible] আত্মিক - মনোজাগতিক। চিন্তাচেতনার ক্ষেত্রে।

[illegible] পরিপক্বতা - সুপরিণতিজাত। পরিপূর্ণ বিকাশসাধন।

[illegible] বস্তুজিজ্ঞাসা- বস্তুজগতের রহস্য উন্মোচন-অন্বেষা। বস্তুজগৎ সম্পর্কে জানার আগ্রহ।

[illegible] গূঢ় অর্থ - প্রচ্ছন্ন গভীর তাৎপর্য।

পাঠ-পরিচিতি
===========

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর æজীবন ও বৃক্ষ” প্রবন্ধটি তাঁর æসংস্কৃতি কথা’ গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

পরার্থে আত্মনিবেদিত সুকৃতিময় সার্থক বিবেকবোধ সম্পন্ন মানবজীবনের মহত্তম প্রত্যাশা থেকে লেখক মানুষের জীবনকাঠামোকে তুলনা করেছেন বৃক্ষের সঙ্গে। তিনি দেখিয়েছেন, বৃক্ষের বিকাশ, পরিপূর্ণতা ও সার্থকতার পেছনে রয়েছে তার নীরব

সাধনা। বৃক্ষ যেমন করে ফুলে ফলে পরিপূর্ণতা পায়, আর সে সব অন্যকে দান করে সার্থকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে, মানব-জীবনের সার্থকতার জন্য তার নিজের সাধনাও তেমনি হওয়া উচিত। তাহলেই স্বার্থপর, অহংকারী, বিবেকহীন, নিষ্ঠুর জবরদস্তিপ্রবণ মানুষের জায়গায় দেখা দেবে প্রেমে, সৌন্দর্যে, সেবায় বিকশিত বিবেকবান পরিপূর্ণ ও সার্থক মানুষ।

মাসিপিসি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিহারের সাঁওতাল পরগনার দুমকায় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯এ মে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ঢাকার বিক্রমপুরে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম নীরদাসুন্দরী দেবী। তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাকনাম মানিক। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে তিনি পড়াশোনা করেন।

.
মাত্র আটচল্লিশ বছর তিনি বেঁচেছিলেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বিএসসি পড়ার সময়ে মাত্র বিশ বছর বয়সে বন্ধুদের সাথে বাজি ধরে তিনি প্রথম গল্প 'অতসী মামী' লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। তাপর জীবনের বাকি আটাশ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে লিখে গেছেন। মাঝে বছর তিনেক মাত্র তিনি চাকরি ও ব্যবসায়িক কাজে নিজেকে জড়ালেও বাকি পুরো সময়টাই তিনি সার্বক্ষণিকভাবে সাহিত্যসেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

.উপন্যাস ও ছোটগল্প লেখক হিসেবে মানিক বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিমান। অল্প সময়েই তিনি সৃষ্টি করেছেন প্রায় চল্লিশটি উপন্যাস ও প্রায় তিনশ ছোটগল্প। সেই সঙ্গে লিখেছেন কিছু কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, ও ডায়েরি। বিজ্ঞানমনস্ক এই লেখক মানুষের জগৎ তথা অন্তর্জীবনের রূপকার হিসেবে সার্থকতা দেখিয়েছেন। একই সঙ্গে সমাজবাস্তবতার শিল্পি হিসেবেও সাক্ষর রেখেছেন। 'জননী', 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পদ্মানদীর মাঝি', পুতুলনাচের ইতিকথা', 'চিহ্ন', প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'প্রাগেতিহাসিক', 'সরিসৃপ', 'সমুদ্রের স্বদ', 'কুষ্ঠরোগীর বৌ', 'টিকটিকি', 'হলুদ পোড়া', 'আজকাল পরশুর গল্প','হারানের নাসজামাই', 'ছোটবকুল পুরের যাত্রী' প্রভৃতি।কলকাতায় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে তেসরা ডিসেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন.

মূলরচনা-১

শেষবেলায় খালে এখন পুরো ভাটা। জল নেমে গিয়ে কাদা আর ভাঙা ইটপাটকেল ও ওজনে ভারি আবর্জনা বেরিয়ে পড়ছে। কংক্রিটের পুলের কাছে খালের ধারে লাগানো সালতি থেকে খড় তোলা হচ্ছে পাড়ে। পাশাপাশি জোড়া লাগানো দুটো বড় সালতি

বোঝাই আঁটিবাঁধা খড় তিনজনের মাথায় চড়ে গিয়ে জমা হচ্ছে ওপরের মস্ত গাদায়। ওঠানামার পথে ওরা খড় ফেলে নিয়েছে কাদায়। সালতি থেকে ওদের মাথায় খড় তুলে দিচ্ছে। দুজন। একজনের বয়স হয়েছে, আধপাকা চুল, রোগা শরীর। অন্যজন মাঝবয়সী, বেঁটে জোয়ান, মাথায় ঠাসা কদমছাটা রুক্ষ চুল।

.

পুলের তলা দিয়ে ভাটার টান ঠেলে এগিয়ে এল সরু লম্বার আরেকটা সালতি, দুহাত চওড়া হয়নি না হয়। দুমাথায় দাড়িয়ে দুজন প্রৌঢ়া বিধবা লগি ঠেলছে, ময়লা মোটা থানের আঁচল দুজনেরই কোমরে বাঁধা। মাঝখানে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে অল্পবয়সী একটি বৌ। গায়ে জামা আছে, নকশা পাড়ের সস্তা সাদা শাড়ি। আঁটসাঁট থমথমে গড়ন, গোলগাল মুখ।মাসি-পিসি ফিরছে কৈলেশ' বুড়ো লোকটি বলল।

কৈলাশ বাহকের মাথায় খড় চাপতে ব্যস্ত ছিল। চটপট শেষ আটিটা চাপিয়ে দিয়ে সে যখন ফিরল, মাসি পিসির সালতি দুহাতের মধ্যে এসে গেছেঃ।

ও মাসি, ওগো পিসি, রাখো রাখো। খপর আছে শুনে যাও।

সামনের দিকে লগি পুতে মাসি-পিসি সালতির গতি ঠেকায়, আহ্লাদি সিঁথির সিঁদুর পর্যন্ত ঘোমটা টেনে দেয়। সামনের থেকে মাসি বলে বিরক্তির সঙ্গে, বেলা আর নেই কৈলেশ। পেছনে থেকে পিসি বলে, অনেকটা যেতে হবে কৈলেশ। মাসি-পিসির গলা ঝরঝরে, আওয়াজ একটু মোটা, একটু ঝংকার আছে। কৈলাশের খবরটা গোপন, দুজনে লম্বা লম্বা সালতির দু-মাথায় থাকলে সম্ভব নয় চুপে চুপে বলা। মাসি বড় সালতির খড় ঠেকানো বাঁশটা চেপে ধরে থাকে, পিসি লগি হাতে নিয়েই পিছন থেকে এগিয়ে আসে সামনের দিকে। আহ্লাদি যেখানে ছিল সেখানে বসেই কান পেতে রাখে। কথাবার্তা সে রব শুনতে পায় সহজেই। কারণ, সে যাতে শুনতে পায় এমনি করেই

বলে কৈলাশ।

.

মূলরচনা-২

বলি মাসি, তোমাকেও বলি পিসি, কৈলাশ শুরু করে, মেয়াকে একদম শ্বশুরঘর পাঠাবে না মনে করেছ যদি, সে কেমন ধারা কথা হয়? এত বড় সোমত্ত মেয়া, তোমরা দুটি মেয়েলোক বাদে ঘরে একটা পুরু ষমানুষ নেই, বিপদ-আপদ ঘটে যদি তো-

.

মাসি বলে, খুনসুটি রাখো দিকি কৈলেশ তোমার, মোদ্দাকথাটা কী তাই কও, বললে না যে খপর আছে কী? পিসি বলে, খপরটা কী তাই কও। বেলা বেশি নেই কৈলেশ।

.

মাসি-পিসির সাথে পারা যাবে না জানে কৈলেশ। অগত্যা ফেনিয়ে রসিয়ে বলবার বদলে সে সোজা কথায় আসে, জগুর সাথে দেখা হলো কাল। খড় তুলে দিতে সাঁঝ হয়ে গেল, তা দোকানে এট্টু-মানে আর কি চা খেতে গেছি চায়ের দোকানে, জগুর সাথে দেখা। মাসি বলে, সেথা ছাড়া আর ওকে কোথা দেখবে। হাতে দুটো পয়সা এলে তোমারও স্বভাব বিগড়ে যায় কৈলেশ। তা, কী বললে জগু?

.

কৈলেশ ফাঁপরে পড়ে আড়চোখে চায় আহ্লাদির দিকে, হঠাৎ বেমক্কা জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করে যে, তা নয়, পুলের কাছেই চায়ের দোকান, মাসি-পিসি গিয়ে জিজ্ঞাসা করুক না সেখানে। তারপরই জোর হারিয়ে বলে, ওসব এরকম ছেড়ে দিয়েছে জগু। লোকটা কেমন বদলে গেছে মাসি, সত্যি কথাপিসি, জগু আর সেই জগু নেই। বৌকে নিতে চায় এখন। তোমরা নাকি পণ করেছ মেয়া পাঠাবে না, তাতেই চটে আছে। সম্মান তো আছে একটা মানুষের, কবার নিতে এল তা মেয়া দিলে না, তাই তো

নিতে আসে না আর। আমি বলি কী, নিজেরা যেচে এবার পাঠিয়ে দেও মেয়াকে।

.

মাসি বলে, পেটে শুকিয়ে লাথি ঝাঁটা খেতে? কলকেপোড়া ছ্যাঁকা খেতে? খুঁটির সাথে দড়িবাঁধা হয়ে থাকতে দিনভর রাতভর? মাসি বলে, মেয়া না পাঠাই, জামাই এলে রাখিনি জামাই-আদরে তাকে? ছাগলটা বেচে দিয়ে খাওয়াইনি ভালোমন্দ দশটা জিনিস?

.

মাসি বলে, ফের আসুক, আদরে রাখব যদ্দিন থাকে। বজ্জাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো। ঘরে এলে খাতির না করব কেন? তবে মেয়া মোরা পাঠাবো না। বুড়ো রহমান একা খড় চাপিয়ে যায় বাহকদের মাথায়, চুপচাপ শুনে যায় এদের কথা। ছল ছল চোখে একবার তাকায় আহ্লাদির দিকে। তার মেয়েটা শ্বশুরবাড়িতে মরেছে অল্পদিন আগে। কিছুতে যেতে চায়নি মেয়েটা, দাপাদাপি করে কেঁদেছে যাওয়া ঠেকাতে, ছোট অবুঝ মেয়ে। তার ভালোর জন্যে তাকে জোর জবরদস্তি করে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আহ্লাদির সঙ্গে তার চেহারায় কোনো মিল নাই। বয়সে সে ছিল অনেক ছোট, চেহারা ছিল অনেক বেশি রোগা। তবু আহ্লাদির ফ্যাকাশে মুখে তারই মুখের ছাপ রহমান দেখতে পায়, খড়ের আঁটি তুলে দেবার ফাঁকে ফাঁকে যখনই সে তাকায় আহ্লাদির দিকে।

.

মূলরচনা-৩

.

কৈলাশ বলে, তবে আসল কথাটা বলি। জগু মোকে বললে, এবার সে মামলা করবে বৌ নেবার জন্য । তার বিয়ে করা বৌকে তোমরা আটকে রেখে বদ মতলবে। মামলা করলে বিপদে পড়। সোয়ামি নিতে চাইলে বৌকে আটকে রাখার আইন নেই।

জেল হয়ে যাবে তোমাদের। আর যেমন বুঝলাম, মামলা জগু করবেই আজকালের মধ্যে। মরবে তোমরা জান মাসি, জান পিসি, মারা পড়বে তোমরা একেবারে।

.

আহ্লাদি একটা শব্দ করে, অস্ফুট আর্তনাদের মতো। মাসি ও পিসি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে কয়েক বার। মনে হয়, মনে তাদের একই কথা উদয় হয়েছে, চোখে চোখে চেয়ে সেটা শুধু জানাজানি করে নিল তারা। মাসি বলল, জেলে নয় গেলাম কৈলেশ, কিন্তু মেয়া যদি সোয়ামির কাছে না যেতে চায় খুন হবার ভয়ে? বলে মাসি বড় সালতির খড় ঠোকনো বাঁশ ছেড়ে দিয়ে লগি গুঁজে দেয় কাদায়, পিসি তরতর করে পিছনে গিয়ে লগি কাদায় গুঁজে হেলে পড়ে শরীরের ভারে সরু লম্বা সালতিটাকে এগিয়ে দেয় ভাটার বিপক্ষে। বেলা একরম নাই। ছায়া নামছে চারদিকে। শকুনরা উড়ে এসে বসছে পাতাশূন্য শুকনো গাছটায়। একটা শকুন উড়ে গেল এ আশ্রয় ছেড়ে অল্প দূরে আরেকটা গাছের দিকে। ডাল ছেড়ে উড়তে আর নতুন ডালে গিয়ে বসতে কী তার পাখা ঝাপটানি! মায়ের বোন মাসি আর বাপের বোন পিসি বাপের ঘরের কেউ নেই আহ্লাদির। দুর্ভিক্ষ কোনোমতে ঠেকিয়েছিল তার বাপ। মহামারীর একটা রোগে, কলেরায়, সে, তার বৌ আর ছেলেটা শেষ হয়ে গেল। মাসি-পিসি তার আশ্রয়ে মাথা গুঁজে আছে অনেক দিন, দূর ছাই সয়ে আর কুড়িয়ে পেতে খেয়ে নিরাশ্রয় বিধবারা যেমন থাকে। নিজেদের ভরণপোষণের কিছু তারা রোজগার করত ধান ভেনে, কাঁথা সেলাই করে, ডালের বড়ি বেচে, হোগলা গেঁথে, শাকপাতা ফলমূল, ডাটা কুড়িয়ে এটাওটা জোগার করে। শাকপাতা, খুদকুঁড়ো ভোজন, বছরে দুজোড়া থান পরন-খরচ তো এই। বছরের পর বছর ধরে কিছু পুঁজি পযন্ত হয়েছিল দুজনের, রুপোর টাকা আধুলি সিকি। দুর্ভিক্ষের সময়টা বাঁচবার জন্য তাদের লড়তে হয়েছে সাংঘাতিকভাবে, আহ্লাদির বাপ তাদের থাকাটা শুধু বরাদ্দ রেখে খাওয়া ছাটাই করে

দিয়েছি একেবারে পুরোপরি। তারও তখন বিষম অবস্থা। নিজেরা বাঁচে না, তার ওপর জগুর লাথির চোটে মরমর মেয়ে সে হাজির। সে কোনদিকে সামলাবে? মাসি-পিসির সেবা-যত্নেই আহ্লাদি অবশ্য সেবার বেঁচে গিয়েছিল, তার বাপ-মাও সেটা স্বীকার করেছে। কিন্তু কী করবে, গলা কেটে রক্ত দিয়ে সে ধার শোধ করা যদি-সম্ভব, অন্ন দেওয়ার ক্ষমতা কোথায় পাবে। পাল্লা দিয়ে মাসি-পিসি আহ্লাদির জীবনের জন্য লড়েছিল, পেল যদি তো খেয়ে না-পেল যদি তো না খেয়েই। অবস্থা যখন তাদের অতি কাহিল, চারদিকে না-খেয়ে মরা শুরু করেছে মানুষ, মরণ ঠেকাতেই ফুরিয়ে আসছে তাদের জীবনীশক্তি; একদিন মাসি বলে পিসিকে, 'একটা কাজ করবি বেয়াইন? তাতেও তোর দুটো পয়সা আসে, মোরও দুটো পয়সা আসে।'

.

মূলরচনা-৪

.

শহরের বাজারে তরিতরকারি ফলমূলের দাম চড়া। গাঁ থেকে কিনে যদি বাজারে গিয়ে বেচে আসে তারা, কিছু রোজগার হবে। একা মাসির ভরসা হয় না সালতি বেয়ে অতদূর যেতে, যাওয়া-আসাও একার দ্বারা হবে না তার। পিসি রাজি হয়েছিল। এতে কিছু হবে কি না হবে ভগবান জানে, কিন্তু যদি হয় তবে রোজগারের একটা নতুন উপায় মাসি পেয়ে যাবে আর সে পাবে না, তাকে না পেলে অন্য কারো সাথে হয় মাসি বন্দোবস্ত করবে, তা কি পারে পিসি ঘটতে দিতে।

.

সেই থেকে শুরু হয় গেরস্তের বাড়তি শাকসবজি ফলমূল নিয়ে মাসি-পিসির সালতি বেয়ে শহরের বাজারে গিয়ে বেচে আসা। গাঁয়ের বাবু বাসিন্দারাও নগদ পয়সার জন্য বাগানের জিনিস বেচতে দেয়।

.

মাসি-পিসির ভাব ছিল আগেও। অবস্থা এক বয়স সমান, একঘরে বাস, পরস্পরের কাছে ছাড়া সুখ-দুঃখের কথা তারা কাকেই-ই বলবে, কেই-বা শুনবে। তবে হিংসা দ্বেষ রেষারেষিও ছিল যথেষ্ট, কোন্দলও বেধে যেত কারণে অকারণে। পিসি এ বাড়ির মেয়ে, এ তার বাপের বাড়ি। মাসি উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এখানে। তাই মাসির উপর পিসির একটা অবজ্ঞা অবহেলার ভাব চিল। এই নিয়ে পিসির অহংকার আর খোঁচাই সবেচেয়ে অসহ্য লাগত মাসির। ধীর শান্ত দুঃখী মানুষ মনে হতো এমনি তাদের কিন্তু ঝগড়া বাধলে অবাক হয়ে যেতে হতো তাদের দেখে। সে কী রাগ, সে কী তেজ, সে কী গোঁ! মনে হতো এই বুঝি কামড়ে দেয় একে অপরকে, এই বুঝি বঁটি দিয়ে।

.

শাকসবিজ বেচে বাঁচবার চেষ্টায় একসঙ্গে কোমর বেঁধে নেমে পড়ামাত্র সব বিরোধ সব পার্থক্য উড়ে গিয়ে দুজনের হয়ে গেল একমন, একপ্রাণ সে মিল জমজমাট হয়ে উঠল আহ্লাদির ভার ঘাড়ে পড়ায়। নিজের পেট ভরানো শুধু নয়, নিজেদের বেঁচে থাকা শুধু নয়, তাদের দুজনেরই এখন আহ্লাদি আছে। খাইয়ে পরিয়ে যত্নে রাখতে হবে তাকে, শ্বশুরঘরের কবল থেকে বাঁচাতে হবে তাকে, গাঁয়ের বজ্জাতদের নজর থেকে সামলে রাখতে হবে, কত দায়িত্ব তাদের, কত কাজ, কত ভাবনা।

.

বাপ-মা বেঁচে থাকলে আহ্লাদিকে হয়ত শ্বশুরবাড়ি যেতে হতো, মাসি-পিসিও বিশেষ কিছু বলতো কি না সন্দেহ। কিন্তু তারা তো নেই, এখন মাসি-পিসিরই সব দায়িত্ব। বিনা পরামর্শে আপনা থেকেই তাদের ঠিক হয়েছিল আহ্লাদিকে পাঠানো হবে না। আহ্লাদিকে কোথাও পাঠানোর কথা তারা ভাবতেও পারে না। বিশেষ করে ওই খুনেদের কাছে কখনো মেয়ে তারা পাঠাতে পারে, যাবার কথা ভাবলেই মেয়ে যখন

আতঙ্কে পাঁশুটে মেরে যায়।

.

মূলরচনা-৫

.

বাপের ঘরদুয়ার জমিজমাটুকু আহ্লাদিকে বর্তেছে, জগুর বৌ নেবার আগ্রহও খুবই স্পষ্ট। সামান্যই ছিল তার বাপের তারও সিকিমতো আছে মোটে, বাকি গেছে গোকুলের কবলে। তবু মুফতে যা পাওয়া যায় তাতেই জগুর প্রবল লোভ।

খালি ঘরে আহ্লাদিকে রেখে কোথাও যাবার সাহস তাদের হয় না। দুজনে মিলে যদি যেতে হয় কোথাও আহ্লাদিকে তারা সঙ্গে নিয়ে যায়।

মাসি বলে, ডরাসনি আহ্লাদি। ভাঁওতা দিয়ে আমাদের দমাবার ফিকির সব। নয় তো কৈলেশকে দিয়ে ওসব কথা বলায় মোদের?

পিসি বলে, 'দুদিন বাদে ফের আসবে দেখিস জামাই। তখন শুধোলে বলবে, কই না, আমি তো ওসব কিছু বলি নি কৈলেশকে।'

.

মাসি বলে, 'চার মাসে পড়লি আর কটা দিন বা। মা-মাসির কাছেই রইতে হয় এ সময়টা, জামাই এলে বুঝিয়ে বলব।' পিসি বলে, 'ছেলের মুখ দেখে পাষান নরম হয়, জানিস আহ্লাদি। তোর পিসে ছিল জগুর মতো। খোকাটা কোলে আসতে কী হয়ে গেল সেই মানুষ। চুপি চুপি এসে এটা ওটা খাওয়ায়, উঠতে বলি তো ওঠে, বসতে বলি বসে। মাসি বলে, তোর মেসো ঠিক ছিল, শাউড়ি ননদ ছিল বাঘ। উঠতে বসতে কী ছ্যাঁচা খেয়েছি ভাবলে বুক কাঁপে। কিন্তু জানিস আহ্লাদি, মেয়েটা যেই কোলে এলো

শাউড়ি ননদ যেন মাকে মাথায় করে রাখলে বাঁচে। পিসি বলে, তুইও যাবি, সোয়ামির ঘর করবি। ডরাসনি, ডর কিসের? বাড়ি ফিরে দীপ জ্বেলে মাসি-পিসি রান্নাবান্না সারতে লেগে যায়। বাইরে দিন কাটলেও আহ্লাদির পরিশ্রম কিন্তু হয়নি, শুয়ে বসেই দিন কেটেছে। তবু মাসি-পিসি কথায় সে একটু শোয়। শরীর নয়, মনটা তার কেমন করছে। নিজেকে তার ছ্যাঁচড়া, নোংরা, নর্দমার মতো লাগে। মাসি-পিসির আড়লে থেকেও সে টের পায় কীভাবে মানুষের পর মানুষ তাকাচ্ছে তার দিকে, কতজন কতভাবে মাসি-পিসির সঙ্গে আলাপ জমাচ্ছে তরিতরকারির মতো তাকেও কেনা যায় কিনা যাচাই করবার জন্য । গাঁয়েরও কতজন তার কত রকমের দর দিয়েছে মাসি-পিসির কাছে। মাসি-পিসি চিনে তারা অনেকটা চুপচাপ হয়ে গেছে আজজাল, কিন্তু গোকুল হাল ছাড়েনি। মাসি-পিসিকে পাগল করে তুলেছে গোকুল। মায়ের বাড়া তার এই মাসি-পিসি, কী দুর্ভোগ তাদের তার জন্য। মাসি-পিসিকে এত যন্ত্রণা দেওয়ার চেয়ে সে নয় শ্বশুরঘরের লাঞ্ছনা সইত, জগুর লাথি খেত। ঈষৎ তন্দ্রার ঘোরে শিউরে ওঠে আহ্লাদি। একপাশে মাসি আর একপাশে পিসিকে না নিয়ে শুলে কি চলবে তার কোনোদিন?

.

মূলরচনা-৬

.

রান্নাক সেরে খাওয়ার আয়োজন করছে মাসি-পিসি, একেবারে ভাতটাত বেড়ে আহ্লাদিকে ডাকবে। ভাগাভাগি কাজ তাদের এমন সহজ হয়ে গেছে যে বলাবলির দরকার তাদের হয় না, দুজনে মিলে কাজ করে যেন একজনে করছে। এবার ব্যঞ্জনে নুন দেখে এ কথা বলতে হয় না পিসিকে, ঠিক সময়ে নুনের পাত্র সে এগিয়ে দেয় মাসির কাছে। বলাবলি করছে তারা আহ্লাদির কথা, আহ্লাদির সুখদুঃখ, আহ্লাদির

সমস্যা, আহ্লাদির ভবিষ্যৎ। জামাই যদি আসে, একটু কড়া কথা তাকে বলা হবে না, এতটুকু খোঁচা দেওয়া হবে না। উপদেশ দিতে গেলে চটবে জামাই, পুরুষ মানুষ তো যতই হোক, এটা করা তার উচিত নয়, এসব কিছু বলা হবে না তাকে। জামাই এসেছে তাই রাখবার যেন ঠাঁই নেই এই ভাব খোবে মাসি-পিসি আহ্লাদিকে শিখিয়ে দিতে হবে সোয়ামি এসেছে বলে আহ্লাদে গদগদ হবা ভাব দেখায়। যে কদিন থাকে জামাই, সে যেন অনুভব করে, সে-ই এখানকার কর্তা, সে-ই সর্বেসর্বা।

.

বাইরে থেকে হাঁক আসে কানাই চৌকিদারের। মাসি-পিসি পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, জোরে নিঃশ্বাস পড়ে দুজনের। সারাদা দিন গেছে লড়ে আর লড়ে। সরকার বাবুর সঙ্গে বাজারের তেলা নিয়ে ঝগড়া করতে অর্ধেক জীব বেরিয়ে গেছে দু-জনের। এখন এল চৌকিদার কানাই হাঙ্গামা না আসে রাত্রে, গাঁয়ে লোক যখন ঘমোচ্ছে।

.

রসুই চলায় ঝাঁপ এঁটে মাসি-পিসি বাইরে যায়। শুক্লপক্ষের একাদশীর উপোস করেছে তারা দুজনে গতকাল। আজ দ্বাদশী, জ্যোৎস্না বেশ উজ্জ্বল। কানাইয়ের সাথে গোকুলের যে তিনজন পেয়াদা এসেছে তাদের মাসি-পিসি চিনতে পারে, মাথায় লাল পাগড়ি-আঁটা লোকটা তাদের অচেনা।

.

কানাই বলে, 'কাছারিবাড়ি যেতে হবে একবার।'

.

মাসি বলে, 'এত রাতে?'

.

পিসি বলে, 'মরণ নেই?'

.

কানাই বলে, 'দারোগাবাবু এসে বসে আছেন বাবুর সাথে যেতে একবার হবেগো দিদিঠাকরুনরা। বেঁধে নিয়ে যাবার হুকুম আছে।'

.

মাসি-পিসি মুখে মুখে তাকায়। পথের পাশে ডোবার ধারে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় তিন চারজন ঘুপটি মেরে আছে। স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে মাসি-পিসি। ওরা যে গাঁয়ের গুণ্ডা সাধু বৈদ্য ওসমানেরা তাতে সন্দেহ নেই, বৈদ্যের ফেটি-বাধা বাবরি চুলওয়ালা মাথাটার পাতার ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছে। তারা যাবে কাছারিতে কানাই আর পেয়াদা কনস্টেবলের সঙ্গে। ওরা এসে আহ্লাদিকে নিয়ে যাবে।

.

মাসি বলে, 'মোদের একজন গেলে হবে না কানাই?'

.

পিসি বলে, 'আমি যাই চলো?'

.

কর্তা ডেকেছেন দুজনকে।

.

মাসি-পিসি দুজনেই আবার তাকায় মুখে মুখে।

.

মাসি বলে, 'কাপড়টা ছেড়ে আসি কানাই।'

.

পিসি বলে, 'হাত ধুয়ে আসি, একদ-লাগবে না।'

.

মূলরচনা-৭

.

তাড়াতাড়িই ফিরে আসে তারা। মাসি নিয়ে আসে বঁটিটা হাতে করে, পিসির হাতে

দেখা যায় রামদার মতো মস্ত একটা কাটারি। মাসি বলে, ‘কানাই, কত্তাকে বোলো, মেয়েনোকের এক রাতে কাছারিবাড়ি যেতে লজ্জা করে। কাল সকালে যাব।’ পিসি বলে, ‘এত রাতে মেয়েনোককে কাছাপিবাড়ি ডাকতে কত্তার লজ্জা করে না কানাই?’ কানই ফুসে ওঠে, ‘না যদি যাও ঠাকরুনরা ভালোয় ভালোয়, ধরে বেঁধে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাবার হুকুম আছে কিন্তু বলে রাখলাম।’ মাসি বঁটিটা বাগিয়ে ধরে দাঁতে দাঁত কামড়ে বলে বটে? ধরে বেঁধে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাবে? এসো। কে এগিয়ে আসবে এসো। বাঁটির এক কোপে গলা ফাঁক করে দেব। পিসি বলে, আয় না বজ্জাত হারামজাদা, এগিয়ে আয় না? কাটারির কোপে গলা কাটি দু-একটার। দু-পা এগোয় তারা দ্বিধাভরে। মাসি-পিসির মধ্যে ভয়ের লেশটুক না দেখে সত্যিই তারা খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। মারাত্বক ভঙ্গিতে বঁটি আর দা উঁচু হয় মসি-পিসির। মাসি বলে, শোনো কানাই, এ কিন্তু এর্কি নয় মোটে। তোমাদের সাথে মোরা মেয়েনোক পারব না জানি কন্তি দুটো একটাকে মারব জখন করব ঠিক। তারপর বিনা পরামর্শে মাসি-পিসি হঠাৎ গলা ছেড়ে দেয়। প্রথমে শুরু করে মাসি, তারপর যোগ দেয় পিসি। আশপাশে যত বাসিন্দা আছে সকলের নাম ধরে গলা ফাটিয়ে তারা হাঁক দেয়, ও বাবাঠাকুর! ও ঘোষ মশায়! ও জনাদ্দন! ওগো কানুর মা! বিপিন! বংশী কানাই অদৃশ্য হয়ে যায় দলবল নিয়ে। হাকাহাঁকি ডাকাডাকি শুরু হয়ে যায় পাড়ায়, অনেকে ছুটে আসে, কেউ কেউ ব্যাপার অনুমান করে ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দেয় বাইরে না বেরিয়ে। এই হট্টগোলের পর আরও নিঝুম আরও থমথমে মনে হয় রাত্রিটা। আহ্লাদিকে মাঝখানে নিয়ে শুয়ে ঘুম আসে না মাসি-পিসির চোখে। বিপদে পড়ে হাঁক দিলে পাড়ার এত লোক ছুটে আসে, এমনভাবে প্রাণ খুলে এতখানি জ্বালার সঙ্গে নিজেদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে গোকুল আর দারোগা ব্যাটার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে সাহস পায়, জানা ছিল না মাসিপিসির। তারা হাঁকডাক শুরু করেছিল

খানিকটা কানাইদের ভড়কে দেবার জন্যে, এত লোক এসে পড়বে আশা করেনি। তাদের জন্য যতটা নয়, গোকুল আর দারোগার ওপর রাগে জ্বালাই যেন ওদের ঘর থেকে টেনে বার করে এনেছে মনে হলো সকলের কথাবার্তা শুনে। কেমন একটা স্বস্তি বোধ করে মাসি-পিসি। বুকে নতুন জোর পায়। মাসি, বলে, জানো বেয়াইন, ওরা ফের ঘুরে আসবে মন বলছে। এত সহজে ছাড়বে কি। পিসি বলে, তাই ভাবছিলাম। মেয়েটাকে কুটুমবাড়ি সরিয়ে দেওয়ায় সোনাদের ঘরে মাঝরাতে আগুণ ধরিয়েছিল সেবার খানিক চুপচাপ ভাবে দুজনে। মাসি বলে, সজাগ রইতে হবে রাতটা। পিসি বলে, তাই ভালো কাঁথা কম্বলটা চুবিয়ে রাখি জলে কী জানি কী হয়। আস্তে চুপি চুপি তারা কথা কয়, আহ্লাদির ঘুম না ভাঙ্গে। অতি সন্তর্পণে তারা বিছানা ছেড়ে ওঠে। আহ্লাদির বাপের আমলের গোরুটা নেই, গামলাটা আছে। ঘড়া থেকে জল ঢেলে মোটা কাঁথা আর পুরনো ছেঁড়া একটা কম্বল চুবিয়ে রাখে, চালায় আগুন ধরে উঠতে উঠতে গোড়ায় চাপা দিয়ে নেভানো যাতে সহজ হয়। ঘড়ায় আর হাঁড়ি কলসিতে আরও জল এনে রাখে তারা ডোবা থেকে। বঁটি আর দা হাতের কাছেই যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসি-পিসি।

শব্দার্থ ও টীকা

==============

[illegible] সালতি - শালকাঠি নির্মিত বা তালকাঠের সরু ডোঙা।

[illegible] বদম ছাঁট- মাথার চুল এমনভাবে ছাঁটা যে তা কদমফুলের আকার ধারণ করে।

[illegible] লগি - হাত ছয়েক লম্বা সরু বাঁশ। নৌকা চালানোর জন্য ব্যবহৃত বাঁশের দণ্ড।

[illegible] খপর - ‘খবর’ শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ।

পাঠ-পরিচিতি

=============

'মাসিপিসি' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতার 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ১৩৫২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় (মার্চ-এপ্রিল ১৯৪৬)। পরে এটি সংকলিত হয় 'পরিস্থিতি' (অক্টোবর ১৯৪৬) নামক গল্পগ্রন্থে। বর্তমান পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে 'ঐতিহ্য' প্রকাশিত মানিক-রচনাবলি পঞ্চম খণ্ড থেকে।

.স্বামীর নির্মম নির্যাতনের শিকার পিতৃমাতৃহীন এক তরুণীর করুন জীবনকাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে 'মাসি-পিসি' গল্প। আহ্লাদি নামক ওই তরুণীর মাসি ও পিসি দুজনই বিধবা ও নিঃস্ব। তারা তাদের অস্তিত্বরক্ষার পাশাপাশি বিরূপ বিশ্ব থেকে আহ্লাদিকে রক্ষার জন্য যে বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী সংগ্রাম পরিচালনা করে সেটাই গল্পটিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। অত্যvচারী স্বামী এবং লালসা-উন্মত্ত জোতদার, দারোগা ও গুণ্ডা-বদমাশদের আক্রমণ থেকে আহ্লাদিকে নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে অসহায় দুই বিধবার দায়িত্বশীল ও মানবিক জীবনযুদ্ধ খুবই প্রশংসনীয়। দুর্ভিক্ষের মর্মস্পর্শী স্মৃতি, জীবিকা নির্বাহের কঠিন সংগ্রাম, নারী হয়ে নৌকাচালনা ও সবজির ব্যবসায় পরিচালনা প্রভৃতি এ গল্পের বৈচিত্র্যময় দিক।

বায়ান্নর দিনগুলো

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

লেখক পরিচিতি

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে রাষ্ট্রের স্থপতি ও জাতির জনক। তাঁর জন্ম ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায়।তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা সায়ারা খাতুন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতি ও দেশব্রতে যুক্ত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভগে অধ্যায়ন করেন। ভাষা-আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি বহু বার কারাবরণ করেছেন।বাঙ্গালির মুক্তির সনদ হিসেবে পরিচিত ছয় দফা দাবি উপস্থাপন করে এক সর্বাত্বক গড়ে তুলে তিনি সমস্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় প্রাদেশিক নির্বাচনে লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে অসহযোগের ডাক দেন তিনি। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন: æএবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।” বাঙ্গালির মুক্তিসংগ্রামকে নস্যাৎ করার জন্য ১৯৭১-এর ২৫এ মার্চ মধ্যরাতের পরে পাকিস্তানি বাহিনী বাঙ্গালির এই অবিসংবাদিত নেতাকে তাঁর ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের আগে অর্থাৎ ২৬এ মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশর স্বধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে গঠিত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর পাকিস্তানের কারাগারে থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি তিনি দেশে ফেরেন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার মহান দায়িত্বে ব্রতী হন। বাঙ্গালির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবদ্দশায় কিংবদন্তি হয়ে ওঠেন।

.
বঙ্গবন্ধুই প্রথম বাঙালি যিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দেন। ১৯৭৩ সালে তিনি 'জুলিও কুরি' পদকে ভূষিত হন।

.
১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে সামরিক বাহিনীর হাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন।

.
মূলরচনা-১

এদিকে জেলের ভেতর আমরা দুইজনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম অনশন ধর্মঘট করার জন্য। আমরা আলোচনা করে ঠিক করেছি, যাই হোক না কেন, আমরা অনশন ভাঙব না। যদি এই পথেই মৃত্যু এসে থাকে তবে তাই হবে। জেল কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে সুপারিনটেনডেন্ট আমীর হোসেন সাহেব ও তখনকার দিনে রাজবন্দিদের ডেপুটি জেলার মোখলেসুর রহমান সাহেব আমাদের বুঝাতে অনেক চেষ্টা করলেন। আমরা তাদের বললাম আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলার নাই আর আমরা সেজন্য অনশন করছি না। সরকার আমাদের বৎসরের পর বৎসর বিনা বিচারে আটক রাখছে, তারই প্রতিবাদ করার জন্য অনশন ধর্মঘট করছি। এতদিন জেল খাটলাম আপনাদের সাথে আমাদের মনোমালিন্য হয় নাই। কারণ আমরা জানি যে, সরকারের হুকুমেই আপনাদের চলতে হয়। মোখলেসুর রহমান সাহেব খুবই অমায়িক, ভদ্র ও শিক্ষিত ছিলেন। তিনি খুব লেখাপড়া করতেন।

.
১৫ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সকালবেলা আমাকে জেলগেট নিয়ে যাওয়া হলো এই কথা বলে যে, আমার সাথে আলোচনা আছে অনশন ধর্মঘটের ব্যাপার নিয়ে আমি যখন

জেলগেটে পৌঁছালাম দেখি, একটু পরে মহিউদ্দিনকেও নিয়ে আসা হয়েছে একই কথা বলে। কয়েকমিনিট পরে আমার মালপত্র, কাপড়চোপড় ও বিছানা নিয়ে জমাদার সাহেব হাজির। বললাম, ব্যাপার কী? কর্তৃপক্ষ বললেন, আপনাদের জেলে পাঠানোর হুকুম হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কোনো জেলে? কেউ কিছু বলেন না। এদিকে আর্মড পুলিশ, আইবি অফিসার ও প্রস্তুত হয়ে এসেছে। খবর চাপা থাকে না। একজন আমাকে বলে দিল, ফরিদপুর জেলে। দুইজনকেই এক জেলে পাঠানো হচ্ছে। তখন নয়টা বেজে গেছে। এগারোটায় নারায়নগঞ্জ থেকে জাহাজ ছাড়ে, সেই জাহাজ আমাদের ধরতে হবে। আমি দেরি করতে শুরু করলাম, কারণ তা না হলে কেউই জানবে না। আমাদের কোথায় পাঠাচ্ছে! প্রথমে আমাদের বইগুলো এক এক করে মেলাতে শুরু করলাম, তারপর কাপড়গুলি। হিসাব নিকাশ, কত টাকা খরচ হয়েছে, কত টাকা আছে। দেরি করতে করতে দশটা বাজিয়ে দিলাম। রওয়ানা করতে আরও আধা ঘন্টা লাগিয়ে দিলাম। আর্মড পুলিশের সুবেদার ও গোয়েন্দা কর্মচারীরা তাড়াতাড়ি করছিল। সুবেদার পাকিস্তান হওয়ার সময় গোপালগঞ্জ ছিল এবং সে একজন বেলুচি ভদ্রলোক। আমাকে খুবই ভালোবাসত এবং শ্রদ্ধা করত। আমাকে দেখেই বলে বসল, ইয়ে কেয়া বাত হ্যায় আপ জেলখানা মে। আমি বললাম, কিসমত। আর কিছুই বললাম না। আমাদের জন্য বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি আনা হয়েছে। গাড়ির ভেতর জানালা উঠিয়ে ও দরজার কপাট বন্ধ করে দিল। দুইজন ভেতরেই আমাদের সাথে বসল। আর একটা গাড়িতে অন্যরা পেছনে পেছনে ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশে রেডের দিকে চলল। সেখানে যেয়ে দেখি পূর্বেই একজন আর্মড পুলিশ ট্যাক্সি রিজার্ভ করে দাঁড়িয়ে আছে। তখন ট্যাক্সি পাওয়া খুবই কষ্টকর ছিল। আমরা আস্তে আস্তে নামলাম ও উঠলাম। কোনো চেনা লোকের সাথে দেখা হলো না। যদিও

এদিক ওদিক অনেকবার তাকিয়ে ছিলাম। ট্যাক্সি তাড়াতাড়ি চালাতে বলল। আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে বললাম, 'বেশি জোরে চালাবেন না, কারণ বাবার কালের জীবনটা যেন রাস্তায় না যায়।'

.

মূলরচনা-২

.

আমরা পৌঁছে খবর পেলাম জাহাজ ছেড়ে গেছে। এখন উপায়? কোথায় আমাদের নিয়ে যাবে? রাত একটায় আর একটা জাহাজ ছাড়বে। আমাদের পুলিশ ব্যারাকের একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। রাত এগারোটায় আমরা স্টেশনে আসলাম। জাহাজ ঘাটেই ছিল, আমরা উঠে পড়লাম। জাহাজ না ছাড়া পর্যন্ত সহকর্মীরা অপেক্ষা করল। রাত একটার সময় সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বললাম, জীবনের আর দেখা না হতেও পারে। সকলে যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয়। দুঃখ আমার নাই। একদিন মরতেই হবে, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যদি মরতে পারি, সে মরাতেও শান্তি আছে। জাহাজ ছেড়ে দিল, আমরা বিছানা করে শুয়ে পড়লাম সকালে দুইজনে পরামর্শ করে ঠিক করলাম জাহাজে অনশন করি কী করে? আমাদের জেলে নিতে হবে অনশন শুরু করার পূর্বে। সমস্ত দিন জাহাজ চলল, রাতে গোয়ালন্দ ঘাটে এলাম। সেখান থেকে ট্রেনে রাত চারটায় ফরিদপুর পৌঁছালাম। রাতে আমাদের জেল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করল না। আমরা দুইজনে জেলে সিপাহিদের ব্যারাকের বারান্দায় কাটালাম। সকালবেলা সুবেদার সাহেবকে বললাম, জেল অফিসাররা না আসলে তো আমাদের জেলে নিবে না, চলেন কিছু নাশতা করে আসি। নাশতা খাবার ইচ্ছা আমাদের নাই। তবে যদি কারও সাথে দেখা হয়ে যায়, তাহলে ফরিদপুরের সহকর্মী জানতে পারবে, আমরা ফরিদপুর জেলে আছি এবং অনশন ধর্মঘট করছি।

.

মূলরচনা-৩

.

আমরা জেলগেটে এসে দেখি, জেলার সাহেব, ডেপুটি জেলার সাহেব এসে গেছেন। আমাদের তাড়াতাড়ি ভেতরে নিয়ে যেতে বললেন। তাঁরা পূর্বেই খবর পেয়েছিলেন। জায়গাও ঠিক করে রেখেছেন, তবে রাজবন্দিদের সাথে নয়, অন্য জায়গায়। আমরা তাড়াতাড়ি ঔষধ খেলাম পেট পরিষ্কার করবার জন্য। তারপর অনশন ধর্মঘট শুরু করলাম। দুই দিন পর অবস্থা খারাপ হলে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। আমাদের দুইজনেরই শরীর খারাপ। মহিউদ্দিন ভুগছে পুরিসিস রোগে, আর আমি ভুগছি নানা রোগে। চার দিন পরে আমাদের নাক দিয়ে জোর করে খাওয়াতে শুরু করল। মহাবিপদ নাকের ভিতর দিয়ে নল পেটের মধ্যে পর্যন্ত দেয়। তারপর নলের মুখে একটা কাপের মতো লাগিয়ে দেয়। একটা ছিদ্রও থাকে। সে কাপের মধ্যে দুধের মতো পাতলা করে খাবার তৈরি করে পেটের ভেতর ঢেলে দেয়। এদের কথা হলো, 'মরতে দেব না। আমার নাকে একটা ব্যারাম ছিল। দুই-তিনবার দেবার পরেই ঘা হয়ে গেছে। রক্ত আসে আর যন্ত্রণা পাই। আমরা আপত্তি করতে লাগলাম। জেল কর্তৃপক্ষ শুনছে না। খুবই কষ্ট হচ্ছে। আমার দুইটা নাকের ভেতরই ঘা হয়ে গেছে। তারা হ্যান্ডকাফ পরানোর লোকজন নিয়ে আসে। বাধা দিলে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে জোর করে ধরে খাওয়াবে। আমাদের শরীরও খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। পাঁচ ছয় দিন পরে বিছানা থেকে ওঠার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। আমরা ইচ্ছা করে কাগজি লেবুর রস দিয়ে লবণ পানি খেতাম। কারণ এর মধ্যে কোনো ফুড ভ্যালু নাই। আমাদের ওজনও কমতে ছিল। নাকের মধ্য দিয়ে নল দিয়ে খাওয়ার সময় নলটা একটু এদিক ওদিক

হলেই আর উপায় থাকবে না। সিভিল সার্জন সাহেব, ডাক্তার সাহেব ও জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের কোনো অসুবিধা না হয়, তার চেষ্টা করছিলেন। বার বার সিভিল সার্জন সাহেব অনশন করতে নিষেধ করছিলেন। আমার ও মহিউদ্দিনের শরীর অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েছে। এখন আর বিছানা থেতক উঠবার শক্তি নাই। আমার হার্টের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে বুঝতে পারলাম। প্যালপিটিশন হয় ভীষণভাবে। নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়। ভাবলাম আর বেশি দিন নাই। একজন কয়েদিকে দিকে গোপনে কয়েক টুকরা কাগজ আনালাম। যদিও হাত কাঁপে তথাপি ছোট ছোট করে চারটা চিঠি লিখলাম। আব্বার কাছে একটা, রেণুর কাছে একটা, আর দুইটা শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবের কাছে। দু-একদিন পরে আর লেখার শক্তি থাকবে না।

.

একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা উদ্বেগ, উৎকন্ঠা নিয়ে দিন কাটালাম, রাতে সিপাহিরা ডিউটিতে এসে খবর দিল, ঢাকায় ভীষণ গোলমাল হয়েছে। কয়েকজন লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে। রেডিওর খবর। ফরিদপুরে হরতাল হয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা শোভাযাত্রা করে জেলগেটে এসেছিল। তারা বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছিল, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।' 'বাঙালিদের শোষন করা চলবে না', 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই', 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই', আরও অনেক স্লোগান। আমার খুব খারাপ লাগল। কারণ ফরিদপুর আমার জেলা, মহিউদ্দিনের নামে কোনো স্লোগান দিচ্ছে না কেন? শুধু 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই' বললেই তো হতো। রাতে যখন ঢাকার খবর পেলাম তখন ভীষণ চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম। কত লোক মারা গেছে বলা কষ্টকর। তবে অনেক লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে শুনেছি। দুজনে পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে আছি। ডাক্তার সাহেব আমাদের নড়াচড়া করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু উত্তেজনায় উঠে

বসলাম।

.

মূলরচনা-৪

.

২২ তারিখে সারা দিন ফরিদপুরে শোভাযাত্রা চলল। কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী এক জায়গায় হলেই স্লোগান দেয়। ছোট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা রাস্তায় বেড়ায় আর স্লোগান দেয়। ২২ তারিখে খবরের কাগজ এল, কিছু কিছু খবর পেলাম। মুসলিম লীগ সরকার কত বড় অপরিণামদর্শিতার কাজ করল। মাতৃভাষা আন্দোলনে পৃথিবীতে এই প্রথম বাঙালিরাই রক্ত দিল। দুনিয়ার কোথাও ভাষা আন্দোলন করার জন্য গুলি করে হত্যা করা হয় নাই জনাব নুরুল আমিন বুঝতে পারলেন না, আমলাতন্ত্র তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল। গুলি হলো মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের এরিয়ার ভিতরে, রাস্তায়ও নয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলেও গুলি না করে গ্রেফতার করলেই তো চলত। আমি ভাবলাম, দেখব কি না জানি না, তবে রক্ত যখন আমাদের ছেলেরা দিয়েছে তখন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে আর উপায় নাই মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।

.

খবরের কাগজে দেখলাম, মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ এমএলএ, মখয়রাত হোসেন এমএলএ, খান সাহেব ওসমান আলী এমএলএ এবং মোহম্মা আবুদল হোসেন ও খন্দকার মোশতাক আহমদসহ শত শত ছাত্র ও কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। দু-একদিনের পরে দেখলাম কয়েকজন প্রফেসর, মওলানা ভাসানী শামসুল হক সাহেব ও বহু আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। নারায়ণগঞ্জে খানসাহেব ওসমান আলীর বাড়ির ভেতরে ঢুকে ভীষণ মারপিট করেছে। বৃদ্ধ খান সাহেব ও তার ছেলেমেয়েদের ওপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছে। সমস্ত ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে

এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। আওয়ামী লীগের কোনো কর্মীই বোধহয় আর বাইরে নাই।

.

আমাদের অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে এসেছে যে, যে-কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর শান্তি-ছায়ায় চিরদিনের জন্য স্থান পেতে পারি। সিভিল সার্জন সাহেব দিনের মধ্যে পাঁচ সাতবার আমাদের দেখতে আসেই। ২৫ তারিখ সকালে যখন আমাকে তিনি পরীক্ষা করছিলেন হঠাৎ দেখলাম তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। তিনি কোনো কথা না বলে, মুখ কালো করে বেরিয়ে গেলেন। আমি বুঝলাম, আমার দিন ফুরিয়ে গেছে। কিছু সময় পরে আবার ফিরে এসে বললেন, 'এভাবে মৃত্যুবরণ করে কি কোনো লাভ হবে? বাংলাদেশ যে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে।' আমার কথা বলতে কষ্ট হয়, আস্তে আস্তে বললাম, অনেক লোক আছে। কাজ পড়ে থাকবে না। দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবাসি, তাদের জন্যই জীবন দিতে পারলাম, এই শান্তি। ডেপুটি জেলার সাহেব বললেন কাউকে খবর দিতে হবে কি না? আপনার ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী কোথায়? আপনার আব্বার কাছে কোনো টেলিগ্রাম করবেন? বললাম, 'দরকার নাই আর তাদের কষ্ট দিতে চাই না।' আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি, হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল। হার্টের দুর্বলতা না থাকলে এত তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে পড়তাম না। একজন কয়েদি ছিল, আমার হাত-পায়ে সরিষার তেল গরম করে মালিশ করতে শুরু করল। মাঝে মাঝে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল।

.

মূলরচনা-৫

.

মহিউদ্দিনের অবস্থাও ভালো না, কারণ প্লুরিসিস আবার আক্রমণ করে বসেছে। আমার চিঠি চারখানা একজন কর্মচারীকে ডেকে তাঁর কাছে দিয়ে বললাম, আমার

মৃত্যুর পরে চিঠি চারখানা ফরিদপুরে আমার এক আত্মীয়ের কাছে পৌঁছে দিতে। তিনি কথা দিলেন, আমি তাঁর কাছে ওয়াদা নিলাম। বার বার আব্বা, মা ভাইবোনদের চেহারা ভেসে আসছিল আমার চোখের সামনে। রেণুর দশা কী হবে? তার তো কেউ নাই দুনিয়ায়। ছোট ছেলেমেয়ে দুইটা অবস্থাই বা কী হবে? তবে আমার আব্বা ও ছোট ভাই ওদের ফেলবে না। এ বিশ্বাস আমার ছিল। চিন্তাশক্তিও হারিয়ে ফেলছিলাম। হাসিনা, কামালকে একবার দেখতেও পারলাম না। বাড়ির কেউ খবর পায় নাই, পেলে নিশ্চয়ই আসত। মহিউদ্দিন ও আমি পাশাপাশি দুইটা খাত পেতে নিয়েছিলাম। একজন আরেক জনের হাত ধরে শুয়ে থাকতাম। দুজনেই চুপচাপ পড়ে থাকি। আমার বুকে ব্যথা শুরু হয়েছে। সিভিল সার্জন সাহেবের কোনো সময়-অসময় ছিল না। আসছেন, দেখছেন চলে যাচ্ছেন। ২৭ তারিখ দিনের বেলা আমার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল। বোধহয় আর দু-একদিন বাঁচতে পারি।

.

২৭ তারিখ রাত আটটার সময় আমরা দুইজন চুপচাপ শুয়ে আছি। কারও সাথে কথা বলার ইচ্ছাও নাই, শক্তিও নাই দুইজনেই শুয়ে শুয়ে কয়েদির সাহায্যে ওজু করে খোদার কাছে মাপ চেয়ে নিয়েছি। দরজা খুলে বাইরে থেকে ডেপুটি জেলার এসে আমার কাছে বসলেন এবং বললেন, ‘আপনাকে যদি মুক্তি দেওয়া হয়, তবে খাবেন তো?’ বললাম, ‘মুক্তি দিলে খাব, না দিলে খাব না।’ তবে আমার লাশ মুক্তি পেয়ে যাবে। ডাক্তার সাহেব এবং আরও কয়েকজন কর্মচারী এসে গেছে, চেয়ে দেখলাম। ডেপুটি জেলার সাহেব বললেন, ‘আমি পড়ে শোনাই আপনার মুক্তির অর্ডার এসে গেছে রেডিওগ্রামে এবং জেলা ম্যাজিস্টেট সাহেবের অফিস থেকে অর্ডার এসেছে। দুইটা অর্ডার পেয়েছি।’ তিনি পড়ে শোনালেন, আমি বিশ্বাস করতে চাইলাম না।

মহিউদ্দিন শুয়ে শুয়ে অর্ডারটা দেখলো এবং বলল যে তোমার অর্ডার এসেছে। আমাকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ডেপুটি সাহেব বললেন, আমাকে অবিশ্বাস করার কিছু নাই। কারণ আমার কোনো স্বার্থ নাই, আপনার মুক্তির আদেশ সত্যিই এসেছে। ডাক্তর সাহেব ডাবের পানি আনিয়াছেন। মহিউদ্দিনকে দুইজন ধরে বসিয়ে দিলেন। সে আমাকে বলল, 'তোমাকে ডাবের পানি আমি খাইয়ে দিব ' দুই চামচ ডাবের পানি দিয়ে মহিউদ্দিন আমার অনশন ভাঙিয়ে দিল।

.

মূলরচনা-৬

.

সকাল দশটার দিকে খরব পেলাম আব্বা এসেছেন। জেলগেটে আমাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভিতরে নিয়ে আসলেন। আমকে দেখেই আব্বার চোখে পানি এসে গেছে। আব্বার সহ্যশক্তি খুব বেশি। কোনো মতে চোখের পানি মুছে ফেললেন। কাছে বসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমার মুক্তির আদেশ হয়েছে, তোমাকে আমি নিয়ে যাব বাড়িতে। আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম তোমার মা, রেণু, হাসিনা ও কামালকে নিয়ে, দুই দিন বসে রইলাম কেউ খবর দেয় না, তোমাকে কোথায় নিয়ে গেছে। তুমি ঢাকায় নাই একথা জেলগেট থেকে বলেছে। যদিও পরে খবর পেলাম, তুমি ফরিদপুর জেলে আছ। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ। নারায়ণগঞ্জ এসে জাহাজ ধরব তারও উপায় নেই। তোমার মা ও রেণুকে ঢাকায় রেখে আমি চলে এসেছি। কারণ আমার সন্দেহ হয়েছিল তোমাকে ফরিদপুর নেওয়া হয়েছে কি না। আজই টেলিগ্রাম করব, তার যেন বাড়িতে রওয়ানা হয়ে যায়। আমি আগামীকাল বা পরশু তোমাকে নিয়ে রওয়ানা করব, বাকি খোদা ভরসা। সিভিল সার্জন সাহেব বলেছেন, তোমাকে নিয়ে যেতে লিখে দিতে হবে যে, 'আমার দায়িত্বে

নিয়ে যাচ্ছি।' আব্বা আমাকে সান্তনা দিলেন এবং বললেন, তিনি খবর পেয়েছেন মহিউদ্দিনও মুক্তি পাবে, তবে একসাথে ছাড়বে না, একদিন পরে ছাড়বে।

.

পরের দিন আব্বা আমাকে নিতে আসলেন। অনেক লোক জেলগেটে হাজির। আমাকে স্ট্রেচারে করে জেলেগেট নিয়ে যাওয়া হলো এবং গেটের বাইরে রেখে দিল, যদি কিছু হয় বাইরে গিয়ে হোক, এই তাদের ধারণা।

.

পাঁচদিন পর বাড়ি পৌঁছালাম। মাকে তো বোঝানো কষ্টকর। হাসু আমার গলা ধরে প্রথমেই বলল, আব্বা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই। একুশে ফেব্রুয়ারি ওরা ঢাকায় ছিল, যা শুনেছে তাই বলে চলেছে। কামাল আমার কাছে আসল না, তবে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি খুব দুর্বল, বিছানায় শুয়ে পড়লাম। গতকাল রেণু ও মা ঢাকা থেকে বাড়ি এসে আমার প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছিল। এক এক করে সকলে যখন আমার কামরা থেকে বিদায় নিল, তখন রেণু কেঁদে ফেলল এবং বলল, তোমার চিঠি পেয়ে আমি বুঝেছিলাম তুমি কিছু একটা করে ফেলবা। আমি তোমাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কাকে বলব নিয়ে যেতে, আব্বাকে বলতে পারি না লজ্জায়। নাসের ভাই বাড়ি নাই। যখন খবর পেলাম খবরের কাগজে তখন লজ্জা শরম ত্যাগ করে আব্বাকে বললাম। আব্বা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাই রওয়ানা করলাম ঢাকায়, সোজা আমাদের বড় নৌকায় তিনজন মাল্লা নিয়ে। কেন তুমি অনশন করতে গিয়েছিলে? এদের কি দয়া মায়া আছে? আমাদের কারও কথাও তোমার মনে ছিল না? কিছু একটা হলে কী উপায় হতো? আমি এই দুটা দুধের বাচ্চা নিয়ে কী করে বাঁচতাম? হাসিনা, কামালের অবস্থা কী হতো? তুমি বলবা খাওয় দাওয়া কষ্ট তো হতো না? মানুষ কি শুধু খাওয়া পরা নিয়ে বেঁচে

থাকতে চায়? আর মরে গেলে দেশের কাজই-বা কীভাবে করতা? আমি তাকে কিছুইবললাম না। তাকে বলতে দিলাম, কারণ মনের কথা প্রকাশ করতে পারলে ব্যথাটা কিছু কমে যায়। রেণু খুব চাপা, আজ যেন কথার বাঁধ ভেঙে গেছে। শুধু বললাম, উপায় ছিল না। বাচ্চা দুইটা ঘুমিয়ে পড়েছে। শুয়ে পড়লাম। সাতাশ-আটাশ মাস পরে আমার সেই পুরানা জায়গায়, পুরানা কামরায়, পুরানা বিছানায় শুয়ে কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠের দিনগুলির কথা মনে পড়ল। ঢাকার খবর সবই পেয়েছিলাম। মহিউদ্দিন ও মুক্তি পেয়েছে। আমি বাইরে এলাম আর আমার সহকর্মীরা আবার জেলে গিয়েছে।

.

মূলরচনা-৭

.

পরের দিন সকালে আব্বা ডাক্তার আনলেন। সিভিল সার্জন সাহেবের প্রেসক্রিপশনও ছিল। ডাক্তার সকলকে বললেন, আমাকে যেন বিছানা থেকে উঠতে না দেওয়া হয়। দিন দশেক পরে আমাকে হাঁটতে হুকুম দিল শুধু বিকেল বেলায়। আমাকে দেখতে রোজই অনেক লোক বাড়িতে আসত। গোপালগঞ্জ, খুলনা ও বরিশাল থেকেও আমার কিছু সংখ্যক সহকর্মী এসেছিল।

.

একদিন সকালে আমি ও রেণু বিছানায় বসে গল্প করছিলাম। হাসু ও কামাল নিচে খেলছিল। হাসু মাঝে মাঝ খেলা ফেলে আমার কাছে আসে আর 'আব্বা' 'আব্বা' বলে ডাকে। কামাল চেয়ে থাকে। একসময় কামাল হাসিনাকে বলছে, 'হাসু আপা হাসু আপা তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।' আমি আর রেণু দুজনেই শুনলাম। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে যেয়ে ওকে কোলে নিয়ে বললাম, 'আমি তো

তোমারও আব্বা'। কামাল আমার কাছে আসতে চাইত না। আজ গলা ধরে পড়ে রইল। বুঝতে পারলাম, এখন আর ও সহ্য করতে পারছে না। নিজের ছেলেও অনেকদিন না দেখলে ভুলে যায়! আমি যখন জেলে যাই তখন ওর বয়স মাত্র কয়েক মাস। রাজনৈতিক কারণে একজনকে বিনা বিচারে বন্দি করে রাখা আর তার আত্মীয়স্বজন ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে দূরে রাখা যে কত বড় জঘন্য কাজ তা কে বুঝবে? মানুষ স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে যায়। আজ দুইশত বৎসর পরে আমরা স্বাধীন হয়েছি। সামান্য হলেও কিছুও আন্দোলনও করেছি স্বাধীনতার জন্য। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস, আজ আমাকে ও আমার সহকর্মীদের বছরের পর বছর জেল খাটতে হচ্ছে। আরও কতকাল খাটতে হয়, কেইবা জানে? একে কি বলে স্বাধীনতা? ভয় আমি পাই না, আর মনও শক্ত হয়েছে।

.

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম। ১৯৫২ সালে ঢাকায় গুলি হওয়ার পরে গ্রামে গ্রামে জনসাধারণ বুঝতে আরম্ভ করেছে যে, যারা শাসন করছে তারা জনগণের আপনজন নয়। খবর নিয়ে জানতে পারলাম, একুশে ফেব্রুয়ারি গুলি হওয়ার খবর বাতাসের সাথে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গেছে এবং ছোট ছোট হাটবাজারে পর্যন্ত হরতাল হয়েছে। মানুষ বুঝতে আরম্ভ করেছে যে, বিশেষ একটা গোষ্ঠী (দল) বাঙালিদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চায়।

.

ভরসা হলো, আর দমাতে পারবে না। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে উপায় নাই। এই আন্দোলনে দেশের লোক সড়া দিয়েছে। ও এগিয়ে এসেছে। কোনো কোনো মাওলানা সাহেবরা ফতোয়া দিয়েছিলেন বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে। তারাও ভয় পেয়ে গেছেন। এখন আর প্রকাশ্যে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহস পাচ্ছেন না।

জনমত সৃষ্টি হয়েছে, জনমতের বিরুদ্ধে যেতে শোষকরাও ভয় পায়। শাসকরা যখন শোষক হয় অথবা শোষকদের সাহায্য করতে আরম্ভ করে তখন দেশের ও জনগণের মঙ্গল হওয়ার চেয়েও অমঙ্গলই বেশি হয়।

শব্দার্থ ও টীকা

================

[illegible] অনশন ধর্মঘট - কোনো ন্যায় দাবি পূরণের লক্ষ্যে একটানা আহার বর্জনের সংকল্প।

[illegible] সুপারিনটেনডেন্ট- তত্ত্বাবধায়ক (superintendent)

[illegible] ডেপুটি জেলার- উপ- কারাধ্যক্ষ।

[illegible] মহিউদ্দিন- মহিউদ্দিন আহমদ (১৯২৫-১৯৯৭)। রাজনীতিবিদ। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্বে ও পরে প্রায় সকল রজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে দীর্ঘকাল কারাভোগ করেন তিনি। ১৯৭৯-১৯৮১কালপর্বে তিনি জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় উপনেতা ছিলেন।

[illegible] বেলুচি- পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের লোক।

[illegible] 'ইয়ে কেয়া বাত.. মে'- এ কেমন কথা, আপনি জেলখানায়।

[illegible] ভিক্টোরিয়া পার্ক- ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়ার নামে ঢাকার সদরঘাট এলাকায় প্রতিষ্ঠিত উদ্যান বর্তমান নাম বাহাদুর শাহ পার্ক।

[illegible] প্লুরিসিস – বক্ষব্যাধি|

[illegible] রেণু- বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও দুঃসময়ের অবিচল সাথি।

[illegible] নুরুল আমিন-১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ছাত্রজনতার ওপর গুলিবর্ষণের জন্য দায়ী তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার বিরোধিকারী। বাংলাদেশে স্বাধীন হওয়ার পর নুরুল আমিন পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।

[illegible] আমলাতন্ত্র - রাষ্ট্র প্রশাসনের সরকারি কর্মচারীদের কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থা।

[illegible] আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ-গণআজাদী লীগ নেতা। ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় অবদান রেখেছেন। পরবর্তকালে আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

[illegible] খয়রাত হোসেন-রাজনীতিবিদ। ১৯৩৮-১৯৪৭ পর্যন্ত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলর। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নাজিমুদ্দিন সরকারের গণবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ১৯৪৮-এ মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।

[illegible] খান সাহেব ওসমান আলী-নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের তৎকালীন বিশিষ্ট নেতা। তিনি আইন সভার সদস্য (এমএলএ) ছিলেন।।

[illegible] খোন্দকার মোশতাক আহমেদ।-বাংলাদেশের আওযামী লীগের তৎকালীন সংগঠক। ১৯৭৫-এ সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর ষড়যন্ত্রমূলক ও মর্মান্তিক হত্যা গোপন সমর্থন ও সহায়তার জন্য নিন্দিত।

[illegible] ছোট ভাই-বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ নাসের।

[illegible] হাসিনা, হাসু-বঙ্গবন্ধু জ্যেষ্ঠ সন্তান শেখ হাসিনা।

[illegible] কামাল - বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল

[illegible] রেডিওগ্রাম-বেতারবার্তা (radiogram)

[illegible] প্রকোষ্ঠ - ঘর বা কুঠরিG

পাঠ-পরিচিতি

===============

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'বায়ান্নর দিনগুলো' তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' (২০১২) গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী ও সহধর্মিণীর অনুরোধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে রাজবন্দি থাকা অবস্থায় এই আত্মজীবনী লেখা আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৯৬৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি থেকে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক আগরতলা মামলায় ঢাকা সেনানিবাসে আটক থাকায় জীবনী লেখা বন্ধ হয়ে যায়। জীবনীটিতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ঘটনাবলি স্থান পেয়েছে। যৌবনের অধিকাংশ সময় কারা প্রকোষ্ঠের নির্জনে কাটলেও জনগণ-অন্তপ্রাণ এ মানুষটি ছিলেন আপসহীন, নির্ভীক। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, গভীর উপলব্ধি ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ তিনি এ গ্রন্থে সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

.

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধুর জেলজীবন ও জেল থেকে মুক্তিলাভের স্মৃতি বিবৃত হয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও বিনাবিচারে বৎসরের পর বৎসর রাজবন্দিদের কারাগারে আটক রাখার প্রতিবাদে ১৯৫২ সালে লেখক অনশন ধর্মঘট করেন। স্মৃতিচারণে ব্যক্ত হয়েছে অনশনকালে

জেল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা ও আচরণ, নেতাকর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ ও তাদের কাছে বার্তা পৌঁছানোর নানা কৌশল ইত্যাদি। স্মৃতিচারণে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে ঢাকায় একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে ছাত্রজনতার মিছিলে গুলির খবর। সেই সঙ্গে অনশনরত অবস্থায় মৃত্যু অত্যাসন্ন জেনে পিতামাতা-স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে ভাবনা এবং অবশেষে মুক্তি পেয়ে স্বজনদের কাছে ফিরে আসার স্মৃতি হৃদয়স্পর্শী বিবরণও পরিস্ফুট হয়েছে সংকলিত অংশে।

জাদুঘরে কেন যাব

আনিসুজ্জামান

লেখক পরিচিতি

আনিসুজ্জামান বাংলাদেশের বরণ্য বুদ্ধিজবী, গবেষক, ও মনস্বী অধ্যাপক। তাঁর জন্ম ১৯৩৭ খ্রিস্টব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায়। ঢাকার প্রিয়নাথ স্কুল থেকে

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; ১৯৫৩ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে আইএ পাশ করেন। পিতা ডা.এ.টি.এম মোয়াজ্জম ও মাতা সৈয়দা খাতুন। তিনি ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি বাংলা স্নাতক সম্মান, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়াও তিনি উষ্চতর শিক্ষা লাভ করেছেন শিকাগো ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি দীর্ঘকাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক।

.

আনিসুজ্জামান উষ্চমানের গবেষণা ও সাবলীল গদ্য রচনার জন্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো : 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য', 'মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র', 'স্বরূপের সন্ধানে'. 'আঠারোশতকের চিঠি', পুরোনো বাংলা গদ্য', 'বাঙালি নারী: সাহিত্যে ও সমাজে', 'বাঙালি সংস্কৃতি ও অন্যান্য', 'ইহজাগতিকতা ও অন্যান্য', 'সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি সাধক', 'চেনা মানুষের মুখ' ইত্যাদি। সাহিত্য ও গবেষণায় কৃতিত্বের জন্যে তিনি একুশে পদক, বাংলা একাডেমিক পুরস্কার, অলাওল সাহিত্য পুরস্কার, কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডিলিট এবং ভারতের সরকারের পদ্মভূষণসহ বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

.

মূলরচনা-১

পাশ্চাত্যদেশে জাদুঘরতত্ব-মিউজিওলজি, উজিওগ্রাফি বা মিউজিয়ম স্টাডিজ-একটা স্বতন্ত্র বিদ্যায়তনিক বিষয় বা শৃঙ্খলা হিসেবে বিকশিত। আলেকজান্দ্রিয়ায় নাকি পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর স্থাপিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বা তার

কাছাকাছি সময়ে ঠিক নির্দিষ্ট করে বলতে পারছি না, আমি তখন উপস্থিত ছিলাম না কিন্তু এটুকু দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, সে সময়ে জাদুঘরতত্ত্ববিদদের কেউ তার ধারের কাছে ছিলেন না। কী প্রেরণা থেকে বিশেষজ্ঞ না হয়েও একজন মানুষ এমন একটা কাজ করেছিলেন এবং দর্শনার্থীরাই বা সেখানে কোন প্রত্যাশা নিয়ে যেতেন, তা আজ ভাববার বিষয়। পৃথিবীর এই প্রথম জাদুঘরে ছিল নিদর্শন-সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার, ছিল উদ্ভিদউদ্যান ও উন্মুক্ত চিড়িয়াখানা, তবে এটা নাকি ছিল মুখ্যত দর্শন-চর্চার কেন্দ্র। এ থেকে আমাদের মনে দুটি ধারণা জন্মে: জাদুঘর গড়ে উঠেছিল প্রতিষ্ঠার রুচিমাফিক, আর তার দর্শকেরা সেখানে যেতেন নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ অংশে, হয়ত কেউ কেউ ঘুরে ফিরে সর্বক্ষেত্রেই উপস্থিত হতেন।

.

কালক্রমে প্রাচীন জিনিসপত্র সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ছিল এবং সম্পন্ন ব্যক্তি বা পরিবারের উদযোগে তা সংগৃহীত হয়ে জাদুঘর গড়ার ভিত্তি রচনা করছিল। প্রাচ্যদেশেও এমন সংগ্রহের কথা অবিদিত ছিল না, তবে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের পরে পাশ্চাত্যদেশে এ ধরনের প্রয়াস অনেক বৃদ্ধি পায় এ রকম ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জাদুঘরে কখনো কখনো জনসাধারণ সামান্য প্রবেশমূল্য দিয়ে ঢুকতে পারত বটে তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সকলের জন্য খোলা থাকত না। রাজ-রাজড়ারা বা সামন্ত প্রভুরা যেসব সংগ্রহশালা গড়ে তুলতেন তাতে থাকতো ওইসব মহাশয়ের শক্তি সম্পদ ও গৌরবের ঘোষণা। ষোল শতকের আগে যৌথ কিংবা নাগরিক সংস্থার উদযোগে জাদুঘর নির্মাণের চেষ্টা হয়নি। নবনির্মিত এসব জাদুঘরই জনসাধারণের জন্যে অবারিত হয় গণতন্ত্রের বিকাশের ফলে কিংবা বিপ্লবের সাফল্যে। ফরাসি বিপ্লবের পরে প্রজাতন্ত্রই সৃষ্টি করে ল্যুভ, উন্মোচিত হয় ভের্সাই প্রাসাদের দ্বার। রুশ বিপ্লবের পরে লেনিনগ্রাদের রাজপ্রাসাদে গড়ে ওঠে হার্মিতিয়ে। টাওয়ার অফ লন্ডনের

মতো ঐতিহাসিক প্রাসাদ এবং তার সংগ্রহ যে সর্বজনের চক্ষুগ্রাহ্য হলো, তা বিপ্লবের না হলেও ক্রমবর্ধমান গণতন্ত্রায়ণের ফলে।ব্যক্তিগত সংগ্রহের অধিকারীরাও এক সময়ে তা জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত করার প্রেরণা বোধ করেন এবং কখনো কখনো এসব ব্যক্তিগত সংগ্রহের দায়িত্বভর রাষ্ট্র গ্রহণ করে তা সকলের গোচরীভূত করার ব্যবস্থা করে।

.

মূলরচনা-২

.

সতেরো শতকে ব্রিটেনের প্রথম পাবলিক মিউজিয়ম গড়ে ওঠে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়-এখানের অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ামের সৃষ্টি পিতাপুত্র দুই ট্র্যাডেসান্ট এবং অ্যাশমোল-এই তিনজনের সংগ্রহ দিয়ে। আঠারো শতকে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ মিউজিয়ম, তবে তার ভিত্তিও ছিল অপর তিনজনের সংগ্রহ- স্যার হ্যানস স্লোন, স্যার রবার্ট কটন ও আর্ল অফ অক্সফোর্ড রবার্ট হার্লির। এসব কথা উল্লেখ করার একমাত্র কারণ এই যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং তার পরিবর্তন যে জাদুঘরের রূপকে বড় রকম প্রভাবান্বিত করে, সে বিষয়টা তুলে ধরা। জাদুঘরে প্রবেশাধিকার না পেলে কিংবা নাগরিকদের জন্যে জাদুঘর গড়ে না উঠলে সেখানে যাওয়ার প্রশ্নই উঠত না, কেন যাব সে চিন্তা তো অনেক দূরের বিষয়। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা যেতে পারে পুঁজিবাদের সমৃদ্ধি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের ফলে উনিশ শতকে জাদুঘরের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোও তাদের উপনিবেশে জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। তেমনি একদিকে শিল্পোন্নতি এবং অন্যদিকে উপনিবেশবাদের অবসানের ফলে বিশ শতকে জাদুঘর স্থাপনার কাজটি দ্রুত এগিয়ে যায়, সদ্য স্বাধীন দেশগুলোও আত্মপরিচয়দানের প্রেরণায় নতুন নতুন জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হয়।

.

এই প্রসঙ্গে আমাদের আবার ফিরে আসতে হবে, তার আগে আর দুটিকথা বলি। একালে আলেকজান্দ্রিয়ার মতো মেলানো-মেশানো জাদুঘরের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত বোধ হয় ব্রিটিশ মিউজিয়ম। সেখনে বৃহৎ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সংগ্রহশালার সঙ্গে রয়েছে বিশাল গ্রন্থাগার। স্বতন্ত্রভাবে রয়েছে উদ্ভিদবিজ্ঞান ও জীববিদ্যার জাদুঘর। রয়েছে নানা বিষয়ে অস্থায়ী প্রদর্শনী ও বক্তৃতার ব্যবস্থা। আর এসবের জন্যে প্রয়োজন হয়েছে প্রাসাদোপম অট্টালিকার। অভ্যাগতদের মধ্যে যিনি যেখানে চান, যা দেখতে চান ও জানতে জান, তিনি তা করতে পারেন। তবে এখনকার প্রবণতা হচ্ছে প্রাকৃতিক জগতের নিদর্শনের থেকে মানবসৃষ্ট নিদর্শন আলাদা করে রাখা আর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র নিয়ে ছোট-বড় জাদুঘর গড়ে তোলা। গত ত্রিশ বছরের ব্রিটেনে জাদুঘরের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে, যদিও ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সমতুল্য দ্বিতীয় কোনো জাদুঘর সে দেশে তৈরি হয়নি। জাদুঘরের বৈচিত্র আজ খুব চোখে পড়ে-সে বৈচিত্র একদিকে যেমন সংগ্রহের বিষয়গত, তেমনি গঠনগত এবং অন্যদিকে প্রশাসনগত।

.

মূলরচনা-৩

.

আজ ভিন্নভিন্ন বিষয়ের জাদুঘর গড়ে তোলার চেষ্টাই প্রবল: প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস, মানববিকাশ ও নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্থানীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সামরিক ইতিহাস, পরিবহন ব্যবস্থা, বিমানযাত্রা, মহাকাশ ভ্রমণ, পরিবেশ কৃষি, উদ্ভিদবিজ্ঞান, জীবতত্ত্ব, শিল্পকলা-তারও আবার নানান বিভাগ-উপবিভাগ। কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবনে ও সাধনা সম্পর্কিত জাদুঘর বহু দেশের বহু কাল ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছে। মৎস্যাধার ও নক্ষত্রশালাও এখন জাদুঘর বলে বিবেচিত। জাদুঘর বলতে আজ আর ব্রিটিশ মিউজিয়ম, ল্যুভ বা হার্মিতিয়ের মতো বিশাল

প্রাসাদ বোঝায় না। উন্মুক্ত জাদুঘর জিনিসটা এখন খুবই প্রচলিত। এমনকি, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ভবনের একাংশে অবস্থিত হলেও জাদুঘর, প্রশাসনের দিক দিয়ে স্বচন্ত্র শ্রেণির জাদুঘরের মধ্যে রয়েছে জাতীয় জাদুঘর, স্থানীয় বা আঞ্চলিক জাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর ও একান্ত বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়া জাদুঘর। আমাদের দেশ থেকে উদাহরণ নিলে বলব, এখানে যেমন আছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, তেমনি আছে চট্টগ্রামের জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, ঢাকার নগর জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, বিজ্ঞান জাদুঘর ও সামরিক জাদুঘর, রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়া, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর, ঢাকার বলধা গার্ডেন এবং বিভিন্ন প্রন্ততাত্ত্বিক খননের এলাকার সাইট মিউজিয়ম। একজন কী দেখতে চান, তা স্থির করে কোথায় যাবেন, তা ঠিক করতে পারেন।

.

তবে জাদুঘরের একটা সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে, যা চমকপ্রদ যা অনন্য, যা লুপ্তপ্রায়, যা বিষ্ময় উদ্রেককারী-এমন সব বস্তু সংগ্রহ কর। গড়পড়তা মানুষ তা দেখতে যায়, দেখে আপ্লুত হয়। এই প্রসঙ্গে আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। ঢাকা আমাদের জাতীয় জাদুঘরের প্রথম ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আবদুল মোনায়েম খান। অনেক আমন্ত্রিতদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিতান্ত কনিষ্ঠ শিক্ষক আমিও ছিলাম। লক্ষ করলাম, শিক্ষামন্ত্রী তাঁর ভাষণ পড়তে গিয়ে মুদ্রিত ‘জাদুঘর’ শব্দের জায়গায় সর্বত্র মিউজিয়ম পড়ছেন।

.

মূলরচনা-৪

.

চা খাওয়ার সময়ে আমাদের শিক্ষাপ্রতিম অর্থমন্ত্রী ড.এম.এন হুদা আমাকে ডাকলেন। কাছে যেতে বললেন, গভর্নর সাহেবের একটা প্রশ্ন আছে, উত্তর দাও।

গভর্নর জিজ্ঞাসা করলেন, মিউজিয়মকে আপনারা জাদুঘর বলেন কেন? একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, স্যার জাদুঘরই মিউজিয়ামের বাংলা প্রতিশব্দ। গভর্নর এবার রাগতস্বরে বললেন, মিউজিয়ামে যে আল্লাহর কালাম রাখা আছে, তা কি জাদু? আল্লাহর কালাম বলতে তাঁর মনে বোধ হয় ছিল চমৎকার তুঘরা হরফে লেখা নুসরাত সাহের আশরাফপুর শিলালিপি-ষোল শতকে এক মসজিদ প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত সংবলিত প্রস্তরখ-সেটা রাখা হয়েছিল সকলের চোখে পড়ার মত জায়গায়। যা হোক, গভর্নরের প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম, স্যার ওই অর্থে জাদু নয় বিস্ময় জাগায় বলে জাদু-মা যেমন সন্তানকে বলে, ওরে আমার জাদুরে। ব্যাখ্যার পরের অংশটা যথার্থ কিনা সে বিষয়ে এখন সন্দেহ হয়, তবে আমার বাক্য শেষ করার আসেই গভর্ণর হুংকার দিলেন, না জাদুঘর বলা চলবে না, মিউজিয়ম বলতে হবে, বাংলাও আপনারা মিউজিয়মই বলবেন। তর্ক করা বৃথা-হুকুম শিরোধার্য করে আমার চ্যান্সেলরের সামনে থেকে পালিয়ে এলাম। যঃ পলায়েতে স জীবতি।

.

আরও একটা প্রবাদ আছে, চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। আমারও তাই হলো। গভর্নরের সামনে থেকে চলে আসার পর মনে হলো, তাঁকে বললাম না কেন, জাদু শব্দটা ফারসি,-তাতে হয়ত তিনি কিছুটা স্বস্তি পেতেন। আপনারা অনেকেই জানেন, জাদুঘর পুরোটাই ফারসি,-তবে জাদুঘরের ঘরটা বাংলা। উর্দুতে জাদুঘরকে বলে আজবখানা, হিন্দিতে অজায়েব-ঘর। খানা, ফারসি, আজব, আজিব, আজায়েব আরবি। জাদু ও আজব শব্দে দ্যোতনা আছে দুরকম। একদিকে কুহক, ইন্দ্রজাল, ভেলকি, অন্যদিকে চমৎকার মনোহর, কৌতূহলোদ্দীপক। আমার ছেলেকে সোজা পেয়ে মেয়েটা জাদু করেছে আর কী জাদু বাংলা গানে। -দু রকম দ্যোতনা প্রকাশ করে।

.

মূলরচনা-৫

.

বয়সের দোষে এক কথা থেকে অন্য কথায় চলে যাচ্ছি। মোনায়েম খান যে সেদিন রাগ করেছিলেন এবং জাদুঘরের অন্য অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও যে তিনি আল্লাহর কালামের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন, এখন মনে হয, তার একটা তাৎপর্য ছিল। তিনি দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, তাই জাদুঘরের সংরক্ষিত মুসলিম ঐতিহ্যমূলক নিদর্শন তাঁকে আকর্ষণ করেছিল এবং বাংলায় হিন্দু- মুসলমান নির্বিশেষে জাদুঘরকে যেহেতু জাদুঘর বলে, তাই তিনি সেটা বর্জন করে 'মিউজিয়ম' শব্দটি বাংলায় ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন মুসলমানদের স্বতন্ত্র প্রয়োগ হিসেবে। জাদুঘরকে যদি তিনি আত্মপরিচয়লাভের ক্ষেত্রে হিসেবে দেখে থাকেন, তাহলে মোটেই ভুল করেননি। অল্প বয়সে আমি যখন প্রথম ঢাকা জাদুঘরে যাই, তখন আমিও একধরনের আত্মপরিচয়ের সূত্র সেখানে খুঁজে পাই-অতটা সচেতনভাবে না হলেও। বাংলা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রাচীন নিদর্শনের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। স্থাপত্যের নিদর্শন বলতে প্রধানত ছিল কাঠের ও পাথরের স্তম্ভ, আর ভাস্কর্য ছিল অজস্র ও নানা উপকরণে তৈরি।

.

বঙ্গদেশে অত যে বৌদ্ধ মূর্তি আছে, সে সম্পর্কে আমর কোনো ধারণা চিল না' পৌরাণিক-লৌকিক অত যে দেবদেবী আছে, তাও জানতাম না। মুদ্রা এবং অস্ত্রশস্ত্র দেখে বাংলায় মুসলিম শাসন সম্পর্কে কিছু ধারণা হয়েছিল-ইসা খাঁর কামানের গায়ে বাংলা লেখা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। পোড়ামাটির কাজও ছিল কত বিচিত্র ও সুন্দর। জাদুঘরের বাইরে তখন রক্ষিত ছিল নীল জাল দেওয়ার মস্ত বড় কড়াই। নীল আন্দোলনের ইতিহাস কিছুটা জানতাম। কড়াইয়ের বিশালত্ব, চিত্তে সম্ভ্রম জাগাবার মতো, কিন্তু তার সঙ্গে যে অনেক দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুবিন্দু জড়িত সেটা মনে পড়তে ভুল হয়নি। ঢাকা জাদুঘরে যা দেখেছিলাম, তার কথা বলতে গেলে পরে দেখা নিদর্শনের

সঙ্গে জড়িযে যেতে পারে-কিন্তু বঙ্গের হাজার বছরের পুরোনো ইতিহাস ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতির যে নমুনা সেখানে ছিল তা থেকে আমি বাঙালির আত্মপিরিচয় লাভ করেছি। পরে তা শক্তিশালী হয়েছে কলকাতা জাদুঘর ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখে।

.

মূলরচনা-৬

.

পরবর্তীকালে পৃথিবীর বহু জাদুঘরে আত্মপরিচয়জ্ঞাপনের এই চেষ্টা নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধরে রাখার যত্নকৃত প্রয়াস দেখেছি। আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রেকো-রোমান মিউজিয়মে ও কায়রো মিউজিয়মে যেমন মিশরের পুরোনো ইতিহাস ধরে রাখা হয়েছে সিয়াটলে ও নর্থ ক্যারোলাইনার পূর্ব প্রান্তে দেখে আমেরিকার আদিবাসীদের নানাবিধ অর্জনের নিদর্শন এবং ইউরোপী বসতিস্থাপনকারীদের প্রথম আগমনকালীন স্মৃতিচিহ্ন। ব্রিটিশ মিউজিয়ম এবং টাওয়ার অফ লন্ডনে ইংল্যান্ডের ইতিহাসের অনেকখানি ধরা আছে। কুয়েতের জাদুঘরে আমার ছেলেবেলায় দেখা ব্রিটিশ ভারতীয় মুদ্রার সযত্ন স্থান দেখে চমৎকৃত হয়েছি। বুঝেছি তাদের আত্মানুসন্ধান শুরু হয়েছে, কিন্তু দূর ইতিহাসের পাথুরে প্রমাণ হাতে আসেনি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জাদুঘরের একটা প্রধান কাজ হলো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং জাতিকে আত্মপরিচয়দানের সূত্র জানানো। জাদুঘরে একটা প্রধান কাজ হলো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং জাতিকে আত্মপরিচয় সূত্র জানানো। জাদুঘরেরর আমাদের যাওয়ার এটা একটা কারণ। সে আত্মপরিচয়লাভ অনেক সময়ে সামাজিক, রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের সূচনা করে।

.

টাওয়ার অফ লন্ডনে সকলে ভিড় করে কোহিনুর দেখতে। আমিও তা দেখতে

গিয়েছিলাম। তখন আমার আরেকটা কথা মনে হয়েছিল। জাদুঘর হৃত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের জায়গা বটে, তবে তা সবসময়ে নিজের জিনিস হবে, এমন কথা নেই। অন্যের ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকার হরণ করে এনেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজেদের জাদুঘর সাজাতে কুণ্ঠিত বোধ করে না।

.

তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে নানা দেশের নানা নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে। কী উপায়ে সংগৃহীত হয়েছে, সেকথা আপাতত মূলতবি রাখলাম। কিন্তু এসব দেখে অভিন্ন মানবসত্তার সন্ধান পাওয়া যায়, মনে হয়, এত দেশে এত কালে মানুষ যা কিছু করেছে, তার সবকিছুর মধ্যে আমি আছি।

.

মূলরচনা-৭

.

জাতীয় জাদুঘর একটা জাতিসত্তার পরিচয় বহন করে। যে সেখানে যায়, সে তার নিজের ও জাতির স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে, সংস্কৃতির সন্ধান পায়, আত্মবিকাশের প্রেরণা লাভ করে। এই যে শত সহস্র বছর আগের সব জিনিস-যা হয়ত একদিন ব্যক্তির বা পরিবারে কুক্ষিগত ছিল-তাকে যে নিজের বলে ভাবতে পারি, তা কি কম কথা? আবার অন্য জাতির অনুরূপ কীর্তির সঙ্গে যখন আমি একাত্মতা অনুভব করি, তখন আমার উত্তরণ হয় বৃহত্তর মানবসমাজে।

.

জাদুঘর আমাদের জ্ঞান দান করে, আমাদের শক্তি জোগায়, আমাদের চেতনা জাগ্রত করে, আমাদের মনোজগৎকে সমৃদ্ধ করে। জাদুঘর একটা শক্তিশালী সামাজিক সংগঠন। সমাজের এক স্তরে সঞ্চিত জ্ঞান তা ছড়িযে দেয় জনসমাজের সাধারণ স্তরে। গণতন্ত্রায়ণের পথও প্রশস্ত হয় এভাবে। জাদুঘর শুধু জ্ঞানই ছড়িয়ে দেয় না,

অলক্ষ্যে ছড়িয়ে দেয় ভাবাদর্শ। কাজেই এ কথা বলা যেতে পারে যে, জাদুঘর যেমন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবনার সৃষ্টি, তেমনি তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের কারণ ঘটাতে পারে।

.

আরও একটা সোজা ব্যাপার আছে। জাদুঘর আমাদের আনন্দ দেয়। মানুষের অনন্ত উদ্ভাবননৈপুণ্যে, তার নিরলস, সৃষ্টিক্ষমতা, তার তন্নিষ্ঠ সৌন্দর্যসাধনা, তার নিজেকে বারংবার অতিক্রম করার প্রয়াস-এসবের সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমরা অশেষ উল্লসিত হই।

.

এতকিছুর পরেও যদি কেউ প্রশ্ন করেন, জাদুঘরে কেন যাবে? সূক্ষ্ম কৌতুক সঞ্চার করে প্রাবন্ধিক পরিশেষে লিখেছেন, যে তাহলে তার একমাত্র উত্তর বোধ হয় এই, 'কে বলছে আপনাকে যেতে?

শব্দার্থ ও টীকা

================

[illegible] মিউজিয়ম স্টাডিজ - জাদুঘর বা প্রদর্শনশালা সংক্রান্ত বিদ্যা।

[illegible] আলেকজান্দ্রিয়া - উত্তরণ মিশরের প্রধান সমুদ্রবন্দর ও সুপ্রাচীন নগর। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩২ অব্দে আলেকজান্ডার দি গ্রেট এই নগর পত্তন করেন। এটি ছিল আলেকজান্ডার যুগের গ্রিক সভ্যতার কেন্দ্র। এখানে বিশ্বের প্রাচীন গ্রন্থাগার (পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত) ছিল।

[illegible] অবিদিত - জানা নেই এমন। অজানা।অজ্ঞাত

[illegible] ইউরোপীয় রেনেসাঁস-খ্রিস্টীয় চৌদ্দ থেকে ষোলো শতক ধরে ইউরোপে শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞাচর্চা ও চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে নবজাগণের মাধ্যমে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণই ইউরোপীয় রেনেসাঁস।

[illegible] ফরাসি বিপ্লব-ইউরোপের প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লব। ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই ফরাসি জনগণ সেখানকার কুখ্যাত বাস্তিল দুর্গ ও কারাগার দখল করে নেয় এবং সমস্ত বন্দিকে মুক্তি দেয়। এর মাধ্যমে এই বিপ্লবের সূচনা হয়। এই বিপ্লবের সূচনা হয়। এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয় ধনিক শ্রেণি আর অত্যাচরিত কৃষকরা ছিল তাদের সহযোগী। বিপ্লবের মূল বাণী ছিল, মুক্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সম্পত্তির পবিত্র অধিকার। এই বিপ্লবের ফলে সামন্তবাদের উৎপাটন হয়।

[illegible] রুশ বিপ্লব-১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর বিপ্লবী নেতা লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সর্বহারা দল বলিশেভিক পার্টি সেখানকার জারতন্ত্রকে হটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। এই বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সমস্ত সম্পত্তি ও উৎপাদনের উপায়ের মালিক হয় জনগণল তথা রাষ্ট্র।

[illegible] টাওয়ার অব লন্ডন - লন্ডনের টেমস নদীর উত্তর তীরবর্তী রাজকীয় দুর্গ। এর মূল অংশে রযেছে সাদা পাথরের গম্বুজ। এটি নির্মিত হয় ১০৭৮ খ্রিস্টাব্দে। এক সময় দুর্গটি রাজকীয ভবন ও রাষ্ট্রীয় কারাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে অস্ত্রশালা ও জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত।

[illegible] গোচরীভূত - অবগত। পরিজ্ঞাত।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়-যুক্তরাজ্যের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় বারো শতকের প্রথম দিকে। শিল্পকলা ও প্রত্নতত্ব সংক্রান্ত জাদুঘর অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ম এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অংঙ্গ-প্রতিষ্ঠান।

[illegible] অ্যাশমল- ইংরেজ পুরাকীর্তি সংগ্রাহক। জন্ম ১৬১৭; মৃত্যু ১৬৯২। তিনি রসায়ন ও পুরাকীর্তি বিষয়ে কয়েকটি বই লিখেছেন। তাঁর সংগ্রহ গুলি দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাশমল মিউজিয়ম।

[illegible] অ্যাশমল মিউজিয়ম-ইংরেজ পুরাকীর্তি সংগ্রাহক অ্যাশমলে সংগ্রহ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত জাদুঘর। এই সংগ্রহশালার প্রাচীন ভবন গড়ে ওঠে ১৬৭৭৯-১৬৮৩ কালপর্বে। বত্মান অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৭ সালে।

[illegible] ব্রিটিশ মিউজিয়ম-প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাকীর্তি সংক্রান্ত এই জাদুঘর ব্রিটেনের জাতীয় জাদুঘর। প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৫৩ । সে সময়ে ব্রিটিশ সরকার স্যার হ্যানস স্লোন, স্যার রবার্ট কটন, আর্ল, অব অক্সফোর্ড রবার্ট হার্লি-এই তিনজন সংগ্রাহকের বই, পাণ্ডুলিপি, মুদ্রা, পুরাকীর্তি ইত্যাদির বিশাল ব্যক্তিগত সংগ্রহ ক্রয় করে এই জাদুঘর গড়ে তোলে।

[illegible] প্রত্নতত্ব - এই বিদ্যায় প্রাচীন মুদ্রা, পুরাকীর্তি ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করে প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কার করা হয়। পুরাতত্ব। archacology।

[illegible] নৃতত্ত্ব- মানব জাতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান। নৃবিদ্যা। anthropology।

[illegible] মৎস্যাধার - মাছ পালনের কাচের আধার। মাছের চৌবাচ্চা। জলজ প্রাণী বা উদ্ভিদ সংরক্ষণের কৃত্রিম জলাধার। aquarium।

[illegible] ল্যুভ- Louvre Museum ফ্রান্সের জাতীয় জাদুঘর ও আর্ট গ্যালারি। প্যারিসে অবস্থিত এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে। এই জাদুঘরের চিত্রশিল্পের সংগ্রহ বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ সংগ্রহ হিসেবে বিবেচিত।

[illegible] হার্মিটেজ - সন্ন্যাসীর নির্জন আশ্রম। মঠ aqurium।

[illegible] বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর-বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জাদুঘর। এ দেশের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, শিল্পকলা ও প্রাকৃতিক ইতিহাসের নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার কাজে এটি নিয়োজিত। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জাদুঘর হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে ঢাকা মহানগরের শাহবাগে এর অবস্থান।

[illegible] জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর-এই জাদুঘর বাংলাদেশের অনন্য জাদুঘর। চট্টগ্রাম নগরের আগ্রাবাদে অবস্থিত এই জাদুঘরে বাংলাদেশের পঁচিশটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ বিদেশি পাঁচটি দেশের জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য রয়েছে।

[illegible] ঢাকা নগর জাদুঘর - ঢাকা সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত এই জাদুঘর নগর ভবনে অবস্থিত।। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে। এর লক্ষ ঢাকা নগরের ঐতিহাসকি নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। এই জাদুঘর ঢাকা সংক্রান্ত বেশিকিছু বই প্রকাশ করেছে।

[illegible] মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর-বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রথম জাদুঘর। মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন ও স্মারক সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্যে এই জ জাদুঘর বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস সবার সামনে তুলে ধরার কাজেই জাদুঘর অনন্য অবদান রেখে আসছে।

[illegible] বঙ্গবন্ধু জাদুঘর- এই জাদুঘর ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় অবস্থি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত বাসবভনকে ১৯৯৭ সালে জাদুগরে রূপান্তরিত করা হয়। এই জাদুঘরে বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের অনেক দুর্লভ ছবি, তাঁর জীবনের শেষ সময়ের কিছু স্মৃতিচিহ্ন এবং তার ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী প্রদর্শনের জন্যে রাখা হয়েছে।

[illegible] বিজ্ঞান জাদুঘর-ঢাকায় অবস্থিত এই জাদুঘরের প্রাতিষ্ঠানিক নাম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর। ১৯৬৫ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে ভৌতবিজ্ঞান, শিল্পপ্রযুক্তি,তথ্যপ্রযুক্তি, মজার বিজ্ঞান, ইত্যাদি গ্যালারি ছাড়াও সায়েন্স পার্ক, আকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র, বিজ্ঞান গ্রন্থাগার ইত্যাদি রয়েছে। এই জাদুঘর তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনমূলক কাজে প্রণোদনা দিয়ে থাকে।

[illegible] সামরিক জাদুঘর- ১৯৮৭ সালে মিরপুর সেনানিবাসের প্রবেশদ্বারে এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে শহরের কেন্দ্রস্থল বিজয় সরণিতে এটি স্থানান্তরিত হয়। প্রাচীন যুগের সমরাস্ত্র, ট্যাংক ক্রুজারসহ নানা ধরনের আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র, আঠারো শতক থেকে এ পর্যন্ত ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের কামান, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিভিন্ন স্মারক ইত্যাদি দেখার সুযোগ এ জাদুঘরে রয়েছে।

[illegible] বরেন্দ্র জাদুঘর- প্রাতিষ্ঠানিক নাম বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর। ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত ও রাজশাহীতে অবস্থিত। এ জাদুঘর বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জাদুঘর। এখানে ভাস্কর্য, খোদিত লিপি, পাণ্ডুলিপি ও প্রাচীন মুদ্রার মূল্যবান সংগ্রহ রয়েছ। বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুদের ইতিহাস, শিল্পকলা ও প্রত্নতত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষণায় এগুলি আকর-উপাদন হিসেবে গণ্য।

[illegible] বরধা গার্ডেন-ঢাকা মহানগরে ওয়ারীতে এর অবস্থান। এটি একাধারে উদ্ভিদ উদ্যান ও জাদুঘর। ভাওয়ালে জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ১৯০৯ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই জাদুঘরের অনেক নিদর্শণ বাংলাদশে জাতীয় জাদুঘরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বলধাগার্ডেনে দেশি-বিদেশি অনেক প্রজাতির গাছপালার আকর্ষণীয় সংগ্রহ রয়েছে।

[illegible] চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ কর্তৃক হস্তান্তরিত ছোট সংগ্রহ নিয়ে ১৯৭৩ সালে এই জাদুঘরের যাত্রা শুরু। এই জাদুঘরে রয়েছে টার্সিয়ারি যুগের মাছের জীবাশ্ম, বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রের উৎখননকৃত শিল্পবস্ত, প্রাচীন ও মধ্যযুগের মুদ্রা, শিলালিপি, ভাষ্কর্য, অস্ত্রশস্ত্র, লোকশিল্প ইত্যাদি নিদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের কিছু দলিলপত্র। এছাড়া একাডেমিক প্রদর্শনী, সেমিনার ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে এ জাদুঘর সক্রিয় ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

[illegible] দ্বিজাতি তত্ব-ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে ভারতকে ধর্মীয় প্রাধান্যের ভিত্তিতে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত করার রাজনৈতিক মতবাদ। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে এ ধারণার উদ্গাতা তদান্তীন্তন মুসলিম লীগ নেতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ।

[illegible] স্থাপত্য- ভবব প্রাসদা ইত্যাদি স্থাপনের কাজ বা এ সংক্রান্ত কলাকৌশল বা বিজ্ঞান

[illegible] ভাস্কর্য -ধাতু বা পাথর ইত্যাদি খোদাইয়ের শিল্প। মূর্তিনির্মাণ কলা। sculpture

[illegible] কলকাতা জাদুঘর-এটি ইন্ডিয়ান মিউজিয়ম বা ভারতীয় জাদুঘর নামেও সমধিক পরিচিত। কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে অবস্থিত এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৪ সালে। এটিও ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন জাদুঘর।

[illegible] ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-প্রাতিষ্ঠানিক নাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। রানি ভিক্টোরিয়ার নামাঙ্কিত স্মৃতিসৌধ। কলকাতা ময়দানে দক্ষিণ কোণে অবস্থিত সুরম্য শ্বেতপাথরে নির্মিত এই স্মৃতিসৌধ অপূর্ব স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন।

[illegible] গ্রেকো রোমান মিউজিয়ম।-মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থিত এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে। এতে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পুরানিদর্শনসহ প্রাচীন গ্রিক-রোমান সভ্যতার অনেক নিদর্শন সংরক্ষিত আছে।

[illegible] কায়রো মিউজিয়ম-মিশরের কায়রোতে অবস্থিত এই জাদুঘর মিশরীয় জাদুঘর নামেও পরিচিত। এটি ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার প্রদর্শন সামগ্রী রয়েছে।

পাঠ-পরিচিতি

===============

এই রচনাটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘরে রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শামসুল হোসাইনের সম্পাদনায় প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকা ‘ঐতিহ্যায়ন’ (২০০৩) থেকে সংকলিত হয়েছে।

.

জাদুঘর হচ্ছে এমন এক সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান যেখানে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহ করে রাখা হয় সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও

গবেষণর জন্যে। অথাৎ জাদুঘর কেবল বর্তমান প্রজন্মের কাছে নিদর্শনগুলি প্রদর্শন করে না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যেও সেগুলি সংরক্ষণ করে রাখে। সংগৃহীত নিদর্শনগুলিকে জাদুঘরে যথাযথভাবে পরিচিতিমূলক বিবরণসহ এমন আকর্ষণীয়ভাবে প্রদর্শন করা হয় যেন তা থেকে দর্শকরা অনেক কিছু জানতে পারে, পাশাপাশি আনন্দও পান। এ ছাড়াও জাদুঘরে আয়োজন করা হয় বক্তৃতা, সেমিনার, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ইত্যাদির। পরিদর্শকদের মধ্যে জানার কৌতূহল বাড়িয়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য। এভাবে জাদুঘর ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান ও তথ্যের সঙ্গে জনগণকে আকৃষ্ট ও সম্পৃক্ত করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই গুরুত্বের কথা এবং মানব জাতির আত্মপরিচয় তুলে ধরায় নানা ধরনের জাদুঘরের ভূমিকার কথা বর্ণিত হয়েছে এই প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি উপস্থাপন করা হয়েছে আকর্ষণীয় ঢঙে ও মনোগ্রাহী ভাষায়।

রেইনকোট

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

লেখক পরিচিতি

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলা কথা সাহিত্যে এক অনন্যসাধারণ প্রতিভার নাম। ১৯৪৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তিনি গাইবান্ধার গোয়াটিয়া গ্রামে মামাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃনিবাস বগুড়া শহরের উপকণ্ঠে আবস্থিত নারুলি গ্রামে।

তাঁর পিতার নাম বি.এম. ইলিয়াস এবং মাতার নাম মরিয়ম ইলিয়াস। তাঁর পিতৃদত্ত নাম আখতারুজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস। প্রথমে বগুড়ায় ও পরে ঢাকায় তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন সরকারি কলেজের বাংলা বিষয়ের অধ্যাপক।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি লেখার সংখ্যা বৃদ্ধির ওপর কখোনো জোর দেননি। বরং গুরত্ব দিয়েছেন গুণগত মানের উপর। জীবন ও জগৎকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহযোগে। দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, দারিদ্র, শোষণ, বঞ্চনা প্রভৃতি বিষয়কে করেছেন সাহিত্যের অর্ন্তভুক্ত। মানুষ জীবনকে সামগ্রিকভাবে অনুধাবন করতে চেয়েছেন এই সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতেই। মানুষের পরম সূক্ষ্ম মনস্তাত্বিক প্রান্তসমূহ উন্মোচনেও তাঁর রয়েছে গভীর দক্ষতা। তাঁর পাঁচটি ছোটগল্প গ্রন্থে সংকলিত আছে মাত্র ২৮টি গল্প। এছাড়া রয়েছে ২টি উপন্যাস ও ১টি প্রবন্ধসংকলন। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলোর নাম: 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' , 'খেয়ালি' 'দুধেভাতে উৎপাত' , ' দোজখের ওম' , 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' ।

তাঁর উপন্যাস দুটি হলো 'চিলেকোঠার সেপাই' ও 'খোয়াবনামা' ।

১৯৯৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারি ঢাকায় ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

.

মূলরচনা-১

ভোররাত থেকে বৃষ্টির আহা! বৃষ্টির ঝমঝম বোল। এই বৃষ্টির মেয়াদ আল্লা দিলে পুরো তিন দিন। কারণ শনিতে সাত মঙ্গলে তিন, আর সব দিন। এটা জেনারেল স্টেটমেন্ট। স্পেসিফিক ক্ল্যাসিফিকেশনও আছে। যেমন, মঙ্গলে ভোররাতে হইল শুরু, তিন দিন মেঘের গুরুগুরু। তারপর, বুধের সকালে নামল জল, বিকালে মেঘ কয় এবার চল। বৃহস্পতি শুক্র কিছু বাদ নাই। কিন্তু এখান ভুলে গেছে। যেটুকু মনে আছে, পুরু বেড-কভারের নিচে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আর-একপশলা ঘুমিয়ে নেওয়ার জন্যে তাই যথেষ্ট। অন্তত তিন দিন ফুটফাট বন্ধ। বাদলায় বন্দুক-বারুদ কি একটু জিরিয়ে নেবে না? এই কটা দিন নিশ্চিন্তে আরাম করো।

তা আর হলো কই? ম্যান প্রোপোজেস।-এমন চমৎকার বাদলার সকলে দরজায় প্রবল কড়া নাড়া শেষ হেমন্তের শীত শীত পর্দা ছিঁড়ে ফালাফালা করে ফেলল। সব ভেস্তে দিল। মিলিটারি! মিলিটারি আজ তার ঘরে। আল্লা গো আল্লাহুম্মা আন্তা সুবহানকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জোয়ালেমিন। পড়তে পড়তে সে দরজার দিকে এগোয়। এই কয়েক মাসে কত সুরাই সে মুখস্থ করেছে। রাস্তায় বেরুলে পাঁচ কালেমা সবসময় রেডি রাখে ঠোঁটের ওপর। কোনোদিকি থেকে কখন মিলিটারি ধরে।-তবু একটা না একটা ভুল হয়েই যায়। দোয়া মনে হলো ঠিকই কিন্তু টুপিটা মাথায় দিতে ভুলে গেল।

দুটো ছিটকিনি, একটা খিল এবং কাঠের ডাশা খুলে দরজার কপাট ফাঁক করতেই বাতাশ আর বৃষ্টির ঝাপটার সঙ্গে ঘরে ঢোকে প্রিন্সিপ্যালের পিওন। আলহামদুলিল্লাহ! মিলিটারি নয়। পিওনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু লোকটা চিনচিনে গলা গম্ভীর স্বরে হাঁকে, ‘স্যার নে সালাম দিয়া।’ বলেই ভাঙাচোরা গালের

খোঁচাখোঁচা দাঁড়িয়ে লোকটা নিজের বাক্যের কোমল শাঁসটুকু শুষে নেয় এবং হুকুম ছাড়ে, তলব কিয়া আভি যানে হোগা।

কী ব্যাপার? বেশি কথা বলার সময় নাই- কলেজের দেওয়াল ঘেঁষে কারা বোমা ফাটিয়ে গেছে গত রাতে। মানে? মিসকিরিয়ান লোগ ইলেকটিরি টেরানসফার্মার তোড় দিয়া। অওর অয়াপস যানেকা টাইম পিরিনসিপাল সাহাবকা কোঠিমে গেরেড ফেকা। গেট তোড় গিয়া। ভয়াবহ কাণ্ড ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার তো কলেজের সামনের দেওয়াল ঘেঁষে। দেওয়ালের পর বাগান, টেনিস, লন। তারপর কলেজ দালান। মস্ত দালা পার হয়ে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার মাঠ। মাঠ পেরিয়ে একটু বা দিকে প্রিনসিপ্যালের কোয়ার্টার। এর সঙ্গে মিলিটারি ক্যাম্প। কলেজে জিমন্যাশিয়্যামে এখন মিলিটারি ক্যাম্প। প্রিনসিপ্যালের বাড়ির গেটে বোমা ফেলা মানে মিলিটারি ক্যাম্প অ্যাটাক করা। সামনের দেওয়ালে বোমা মেরে এতটা পথ ক্রস করে গেল কী করে? সে জানতে চায়, 'ক্যায়সে' ? প্রিনসিপালের পিওন জানবে কী করে? 'উও আপ হি কহ তা।'

.

মূলরচনা-২

মানে? সেই বলবে কী করে? পিওন কি তাকে মিসক্রিয়ান্টদের লোক ভাবে নাকি? ও তার মাথাটা আপনা আপনি নিচু হলে মুখ দিয়ে পানির মতো গড়িয়ে পড়ে, 'ইসহাক মিয়া, বৈঠিয়ে। চা টা খাইয়ে। আমার এই পাঁচ সাত মিনিট লাগেগা।'

'নেহি।' নাশতার আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিয়ে ইসহাক বলে, 'আব্দুস সাত্তার মিরধাকা ঘর যানে হোগা। আপ আভি আইয়ে। এক কর্ণেল সাহাব পঁওস গিয়া। সব পরফরকো

এত্তেলা দিয়া। ফওরন আইয়ে।'   কর্নেলের নেতৃত্বে মিলিটারির হাতে কলেজটা এবং তাকেও ন্যস্ত করে ইসহাক বেরিয়ে যায়।, রাস্তায় ঘড়ঘড় করতে থাকা বেটি ট্যাকসির গর্জন তুলে সে রওয়ানা হলো জিওগ্রাফির প্রফেসররের বাড়ির দিকে। ইসহাক নিজেই এখন মিলিটারি কর্নেল বললেও চল। তবে ভোরবেলা কলেজের ভেতরে কর্নেল খোদ চলে আসায় সে হয়ত ডেমোটড হয়েছে লেফটেন্যান্ট কর্নেলে। আরও নিচেও নামাতে পারে কিন্তু ক্যাপ্টেনের এদিকে তাকে ঠেলা মুশকিল। মিলিটারি প্রাদুর্ভাবের পর থেকে তাকে দেখে কলেজের সবাই তটস্থ। এপ্রিলের শুরু থেকে সে বাংলা বলা ছেড়েছে। কোনকালে দাদা না পরদাদার ভায়রার মামু না কে যেন দিল্লিওয়ালা কোন সাহেবের খাস খানসামা ছিল, সেই সুবাদে দিনরাত এখন উর্দু বলে।

যেতেই হবে? অসময়ের বৃষ্টিতে ভিজে তোমার হাঁপানির টানটা আবার-। বৌয়ের এসব সোয়াগের কথা শুনলে কি তার চলবে? বৌ কি প্রিনসিপ্যালের ধমকের ভাগ নেবে? এর ওপর কলেজে কর্নেল এসেছে। কপালে আজ কী আছে আল্লাই জানে, ফায়ারিং স্কোয়াডে যদি দাঁড় করিয়ে দেয় তো কর্নেল সাহেবের হাতে পায়ে ধরে ঠিক কপালে গুলি করার হুকুম জারি করানো যায় না? প্রিনসিপ্যাল কি তার জন্যে কর্নেলের কাছে এই তদবিরটুকু করবে না? পাকিস্তানের জন্যে প্রিনসিপ্যালের দিনরাত দোয়া-দুরুদ পড়ছে। সময় নাই অসময় নাই আল্লার দরবারে কান্নাকাটি করে এবং সময় করে কলিগদের গালাগালিও করে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি প্রিনসিপ্যাল মিলিটারির বড় কর্তাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করেছিল, পাকিস্তান যদি বাঁচাতে হয় তো সব স্কুলকলেজ থেকে শহিদ মিনার হটাও। এগুলো হলো পাকিস্তানের শরীরের কাঁটা। পাকিস্তানের পাক সাফ শরীরটাকে নীরোগ করতে হলে

এসব কাঁটা ওপড়াতে হবে। তা মিলিটারি ডক্টর আফাজ আহমদের পরামর্শ শুনেছে, গ্রামে-গঞ্জে যেখানেই গেছে, প্রথমেই কামান তাক করছে শহিদ মিনারের দিকে। দেশে একটা কলেজে শহিদ মিনার আর অক্ষত নাই। তা প্রিনসিপ্যাল তাদের এত বড় একটা পরামর্শ দিল, আর সামান্য এক লেকচারারকে গুলি করার সময় শরীরের লতুফালতু জায়গা বাদ দিয়ে কপালটা টার্গেট করার অনুরোধটা তার মানবে না? আবার প্রিসসিপ্যালকে সে এত সার্ভিস দিচ্ছে, তার কলিগের, তওবা, সাব-অর্ডিনেটের জন্যে এতটুকু করবে না? প্যান্টের ভেতর পালিয়ে দিতে দিতে সে শোনে রান্নাঘর থেকে বৌ বলছে, তাড়াতাড়ি চলে এসো। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে মিরপুর ব্রিজেরে দিক থেকে গুলির আওয়াজ আসছিল। কখন কী হয়। এসব কথা এখন বলার দরকারটা কী?-রেডিও টেলিভিশনে হরদম বলছে, সিচুয়েশেন নর্ম্যাল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক। দুশমনকে সম্পূর্ণ কবজা করা গেছে। মিসক্রিয়েন্টরা সব খতম। প্রেসিডেন্ট দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। কিছুদিন বাদে বাদে তার ভাষণ শোনা যায়, আওয়াজ আলটিমেট এইম রিমেইনস দ্যা সেম, দ্যাট ইজ টু হ্যান্ডওভার পাওয়ার টু দি ইলেকটেড রিপ্রেজেনটেটিভস অব দ্যা পিপল। সবই তো নর্ম্যাল হয়ে আসছে। বাঙালি, আই মিন, ইস্ট পাকিস্তানি গভর্নর, মন্ত্রীরা ইস্ট পাকিস্তানি। সবই তো স্বাভাবিক। এখন বৌ তার এসব বাজে কথা বলে কেন? ইস! আসমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

.

মূলরচনা-৩

‘এই বৃষ্টিতে শুধু ছাতায় কুলাবে না গো।’ বৌয়ের আরেক দফা সোয়াগ শোনা গেল, ‘তুমি বরং মিন্টুর রেইনকোটটা নিয়ে যাও।’

ইস! আবার মিন্টু বৌয়ের ভাইটার জন্যেই তাকে এক্সট্রা তটস্থ হয়ে থাকতে হয়। বাড়ি থেকে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার মগবাজারের দুই কামরার ফ্ল্যাট থেকেই তো মিন্টু চলে গেল জুন মাসে, জুনের ২৩ তারিখে। জুলাইয়ের পয়রা তোরিখে সে বাড়ি শিফট করল। বলা যায় না, ওখানে যদি কেউ কিছু আঁচ করে থাকে ও চলে যাবার তিনদিন পরেই পাশের ফ্ল্যাটে গোলগাল মহিলা তার বৌকে জিগ্যেস করেছিল, ভাবি, আপনার ভাইকে দেখছি না। ব্যাস, এই শুনেই সে বাড়ি বদলাব কার জন্যে লেগে গেল হন্যে হয়ে। মিলিটারি লাগার পর থেকে এই নিয়ে চারবার বাড়ি পাল্টানো হলো। এখানে আসার পর নিচের তলার ভদ্রলোক একদিন বলছিল, ‘আমার ভাইটাকে আর ঢাকায় রাখলাম না।’ যে গোলমাল, বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। শুনে বুকটা তার টিপটিপ করছিল, এবার যদি তার শালার প্রসঙ্গ তোলে? নিরাপত্তার জন্যেই সে এখনে এসেছে। কলেজ থেকে দূরে, আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে। শহর থেকেও দূরে বলা যায়। বে ভেবেছিল নতুন এলকা, পুবদিকে জানলা ধরে দাঁড়ালে চোখে পড়ে বিল আর ধানক্ষেত। তা কী বিপদ! এদিকে নাকি নৌকা করে চলে আসে স্টেনগানওয়ালা ছোকরার দল। এদিককার মানুষ চোখে খালি নৌকা দেখে, নৌকা ভরা অস্ত্র। এর ওপর বৌ যদি মিন্টুর কথা তোলে তো অস্ত্র ঢুকে পড়ে তার ঘরের মধ্যিখানে। মিন্টু যে কোথায় গেছে তা সেও জানে তার বৌও জানে। কিসিনজার সাহেব বলেছেন, এসব হলো পাকিস্তানের ইনটার্নাল অ্যাফেয়ার। মানুষ মেরে সাফ করে দেয়, বাড়িঘর, গ্রাম বাজারহাট, জ্বালিয়ে দিচ্ছে, কারো কোনো মাথাব্যাথা নাই। এসব হলো ইনটার্নাল অ্যাফেয়ার। -না, না, এ ধরনের ভাবনা ধারের কাছে ঘেষতে দেওয়া ছিক

নয়। নিচের ফ্ল্যাটে থাকে ওয়েলডিং ওয়ার্কশপের মালিক, তার শ্বশুর নিশ্চয়ই সর্দারগোছের রাজাকার। সপ্তাহে দুইতিন দিন মেয়ের বাড়িতে রেফ্রিজারেটর, টেপ রেকর্ডার, দামি দামি সোফাসেট, ফ্যান, খাট-পালং সব চালান পাঠায়।

'দেখি তো ফিট করে কিনা।' আসমা এগিয়ে এসে তার গায়ে রেইনকোট চড়িয়ে দিতে দিতে বলে, মিন্টু তো আমার অনেক লম্বা। তোমার গায়ে হবে তো?-দোখো ফের মিন্টুর দৈর্ঘ্যের তুলনা করে তার সঙ্গে। এই ভাইকে নিয়ে এরকম বাড়াবাড়ি করাটা কি আসমার ঠিক হচ্ছে?

'ভালোই হলো। তোমার গোড়ামি পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে। পায়েও বৃষ্টি লাগবে না।' এখানেই আসমার শেষ নয়। রেইনকোটের সঙ্গেকার টুপি এনে চড়িয়ে দেয় তার মাথায়।

মূলরচনা-৪

'আব্বু ছোটো মামা হয়েছে। আব্বু চোটোমামা হয়েছে।' আড়াই বছরের মেয়ের সদ্য-ঘুম ভাঙা গলায় ভাঙা ভাঙা বুলি শুনে সে চমকে ওঠে, মিন্টু কি ঢুকে পড়লো অস্ত্রশস্ত্র হাতে? এর মানে পিছে পিছে ঢুকছে মিলিটারি। তার মানে-। না, দরজার ছিটকিনি ও খিল সব বন্ধ। তাকে কি মিন্টুর মতো দেখাচ্ছে? মিলিটারি আবার ভুল করে বসবে না তো? এর মধ্যে তা পাঁচ বছরের ছেলেটা গম্ভীর চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করে রায় দেয়, 'আব্বুকে ছোট মামার মতো দেখাচ্ছে। আব্বু তাহলে মুক্তিবাহিনী। তাই না? এ তো ভাবনার কথা।। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের নতুন রূপে সে ভ্যাবাচ্যাকা খায়। না-খামাখা ভয় পাচ্ছে। বৃষ্টির দিনে রেইনকোট গায়ে দেওয়াটা অপরাধ হবে কেন? মিলিটারির কি আর বিবেচনাবোধ

নাই? প্রিনসিপ্যাল ড. আফাজ আমহদ ঠিকই বলে, শোনেন মিলিটারি যাদের ধরে মিছেমিছি ধরে না। সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজের সঙ্গে তারা সামহাউ অর আদার ইনভলভড। তা সে তো বাপু এসব থেকে শতহাত দূরে। শালা তার বর্ডার ক্রস করল, ফিরে এসে দেশের ভেতরে দমাদম মিলিটারি মারে। তাতে আর দুলাভাইয়া দোষটা কোথায়? এই যে মিলিটারি প্রত্যেকদিন এই ঢাকা শহরের বাজার পোড়ায়, বস্তিতে আগুন লাগিয়ে টপাটপ মানুষ মারে, মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়-, সে কখনো এসব নিয়ে টু শব্দটি করছে? কলেজের দেওয়াল ঘেষে প্রিনসিপ্যালের কোয়ার্টারের পাশে মিলিটারি ক্যাম্প, ক্ল্যাশটলাশ সব বন্ধ। ছেলেরা কেউ আসে না। মাস্টারদের হাজিরা দিতে হয়, তাও বহু টিচার গা ঢাকা দিয়েছে কবে থেকে। সে তো রোজ টাইমলি যায়। স্টাফরুমে কলিগরা ফিসফিস করে, কোথায় কোন ব্রিজ উড়ে গেল, কোথায় সাত মিলিটারির লাশ পড়েছে ছেলেদের গুলিতে, এই কলেজের কোন কোন ছেলে ফ্রন্টে গেছে-, কই সে তো এসব আলাপের মধ্যে কখনো থাকে না। এসব কথা শুরু হলেই আলগোছে উঠে সে চলে যায় প্রিনসিপ্যালের কামরায়। ড. আফাজ আহমদের খ্যাসখ্যাস গলায় হিন্দুস্তান ও মিসক্রিয়েন্টদের আশু ও অবশ্যম্ভাবী পতন সম্বন্ধে নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী শোনে। ওই ঘরে আজকাল সহজে কেউ ঘেঁষে না। উর্দুর প্রফেসর আকবর সাজিদকে প্রিনসিপ্যাল আজকাল তোয়াজ করে। মিন্টুর ফেলে-যাওয়া নাকি রেখে-যাওয়া রেইনকোটে ঢোকার পর থেকে তার পা শিরশির করছে, আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। প্রিনসিপ্যাল তাকে ডেকে পাঠিয়েছে সেই কখন!

মূলরচনা-৫

রাস্তায় একটটা রিকশা নাই। তা রিকশার পরোয়াও সে এখন করছে না। রেইনকোটের ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে বাসস্ট্যান্ড যেতে তার কোনো অসুবিধে হবে না। রেইনকোটের ওপর বৃষ্টি পড়ছে অবিরাম। কি মজা, আর গায়ে লাগে না একটি ফোঁটা। টুপির বারান্দা বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়লে কয়েক ফোঁটা সে চেটে দেখে। ঠিক পানসে স্বাদ নয়, টুপির তেজ কি পানিতেও লাগল নাকি? তাকে কি মিলিটারির মতো দেখাচ্ছে? পাঞ্জাব আর্টিলারি, না বালুচ রেজিমেন্ট, না কম্যান্ডো ফোর্স, নাকি প্যারা মিলিটারি, না মিলিটারি পুলিশ,-ওদের তো একেক গুষ্টির একেক নাম, একেক সুরত। তার রেইনকোটে তাকে কি নতুন কোনো বাহিনীর লোক বলে মনে হচ্ছে? হোক। সে বেশ হনহন করে হাঁটে। শেষ হেমন্তের বৃষ্টিতে বেশ শীত শীত ভাব। কিন্তু রেইনকোটের ভেতরে কী সুন্দর ওম। মিন্টুটা এই রেইনকোট রেখে গিয়ে কী ভালোই যে করছে।

বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে বাসের জন্য তাকে তাকাতে হয় উত্তরেই। মিলিটারি লরির ল্যাজটাও দেখাও যাচ্ছে না। আবার তার বাসেরও তো নামগন্ধ নেই। বাসস্ট্যান্ডে জনপ্রাণী বলতে সে একেবারে একলা। রাস্তার পাশে পান-বিড়ির সিগ্রেটের ছোট দোকানটার ঝাঁপ একটকুখানি তুলে দোকানদারও তাকিয়ে রয়েছে উত্তরেই, ওদিকে কি কোনো গোলমাল হলো নাকি? দোকানদার ছেলেটা একটু বাচাল টাইপের। বাসস্ট্যান্ডে তাকে দেখলেই ছোড়াটা বিড়িবিড় করে, কাল শোনেন নাই. মিরপুরের বিল দিয়া দুই নৌকা বোঝাই কইরা আইছিল। একটা জিপ উড়াইয়া দিছে, কমপক্ষে পাঁচটা খানসেনা খতম। বিবিস কইছে, রংপুর দিনাজপুরের হাফের বেশি জায়গা

স্বাধীন। এর মধ্যেই ছিপছিপে বৃষ্টিতে লালচে আভা তুলে এসে পড়ল লাল রঙের স্টেট বাস।

বাসে যাত্রী কম। না, না, কন্ডাক্টররা সবসময় যেমন-খালি গাড়ি বলে চ্যাঁচায় সেরকম নয়। সত্যি সত্যি অর্ধেকের বেশি সিট খালি।। সে বাসে উঠলে তার রেইনকোটের পানি পড়তে লাগল বাসের ভিজে মাটিতে। এ জন্যে তার একটু খারাপ কথা, অন্তত টিটকারি শোনার কথা। কিন্তু তাকে কেউ কিছু বলে না। ঠোঁটে তার একটু হাসি বিছানো থাকে। এই নীরব কিন্তু স্পষ্ট হাসির কারণ কি এই যে, তার রেইনকোটের পানিতে বাসে সয়লাব হয়ে গেলেও কেউ টুঁ শব্দটি করছে না? তার পোশাক কি সবাইকে ঘাবড়ে দিল নাকি?

মূলরচনা-৬

খালি রাস্তা পেয়ে বাস চলে খুব জোরে। কিন্তু তার আসনটি সে নির্বাচন করতে পারছে না। টলতে টলতে একবার এই সিট দেখে, পছন্দ হয় না বলে ফের ওই সিটের দিকে যায়। এমন সময় পেছনের দিক থেকে দুজন যাত্রী উঠে পড়ে তাড়াহুড়ো করে, 'রাখো রাখো' বলতে বলতে ঝুঁকিক নিয়ে তারা নেমে পড়ে চলন্ত বাস থেকে। সে তাদের দিকে তাকায় এবং বুঝতে পারে, এরা পালাল ঠিক তাকে দেখেই। লোক দুটো নিশ্চয়ই ক্রিমিনাল। একটা চোর, আরেকটা পকেটমার। কিংবা দুটোই চোর অথবা পকেটমার। নামবার মুহূর্তে দুটোর মধ্যে সর্দার টাইপেরটা তার দিকে পেছন ফিরে তাকাল। সেই চোখভরা ভয়, কেবল ভয়।

জুৎসই সিট বেছে নিয়ে সে ধপাস করে বসতেই ফোমে ফস করে আওয়াজ হয় এবং তাইতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় সামনের সিটে বসা তিনজন যাত্রী। হুঁ! এদের সে ঠিক চোর অথবা পকেটমার বলে ঠিক শনাক্ত করে ফেলে। ডাকাতও হতে পারে। কিংবা মিলিটারি কোনো বস্তিতে আগুন লাগিয়ে চলে এলে এরা ছোটে সেখানে লুটপাট করতে। অথবা মিলিটারি কোথাও লুটপাট করলে এরা গিয়ে উচ্ছিষ্ট কুড়ায়। তিনটেই পরের স্টপেজে নামার জন্যে অনেক আগেই ধরফর করে উঠে দাঁড়ায় এবং বাস থামার সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ে ঝটপট পায়। তিনটে ক্রিমিনালের একটাও তার দিকে আর ফিরে তাকায় না। তার মানে তাকে বেশি ভয় পেয়েছে বলেই তার সঙ্গে চোখাচোখি এড়াতে এদের এত কসরত।

যাক, মিন্টুর রেইনকোট তার কাজে হচ্ছে। চোর ছ্যাঁচোর পকেটমার সব কেটে পড়ছে। ভালো মানুষেরা থাক। সে বেশ সৎসঙ্গে চলে যাবে একেবারে কলেজ পর্যন্ত।

.

মূলরচনা-৭

.

আসাদ গেট বাসস্টপেজে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে দাড়িয়ে অপেক্ষা করছিল বেশ কয়েকজন মানুষ। ছাতা হাতে কেউ কেউ নিজ নিজ ছাতার নিচে এবং ছাতা ছাড়া অনেকেই অন্যের ছাতার নিচে মাথার অন্তত খানিকটা পেতে দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট থেকে আত্মরক্ষা করতে শরীর গুলোকে আঁকাবাঁকা করছিল। বাস থামালে সে দেখল, একে একে নয়জন প্যাসেঞ্জার বাসে উঠল। সে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবাইকে দেখে। তো তার দিকে তাকিয়ে নয়জনের তিনজন আরো রাখো এবং একজন ‘রোখো রোখো’ বলতে বলতে নেমে পড়ল ধরফড় করে। শেষের জন বোধ হয় এমনি অর্ডিনারি

চোর, ছিচকে চোর হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আর প্রথম তিনটে কোথাও সুন্দরী মেয়ে মানুষ দেখলে মিলিটারিকে খবর দেয় কিংবা মিলিটারির কাছ থেকে বন্দুক নিয়ে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' , 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দিয়ে মহল্লায় মহল্লায় ঘোরে আর সুন্দরী মেয়েদের ধরে এনে পৌঁছে দেয় মিলিটারি ক্যাম্পে। এগুলো হলো রাজাকার। ফের নতুন করে অপরাধীমুক্ত বাসে যেতে এখন ভালো লাগছে। জানালার বাইরে বৃষ্টি আঁশ উড়ছে ঠান্ডা হাওয়ায় গাছপালা, লোকজন, দোকাপাট ও বাড়িঘরের ওপর ট্রান্সপারেন্ট আবরণ দেখে তার এক্সট্রা ভালো লাগে। সমস্ত ভালো লাগাটা চিড় খায়, বাস হঠাৎ করে ব্রেক কষলো। তখন তাকে তাকাতে হয় বাঁয়ে চোখ পড়ে নির্মীয়মাণ মসজিদের ছাদের দিকে দরজা থেকে ঠান্ডা হাওয়া এসে লাগে তার মুখে এবং নাকের ভেতর দিয়ে সেই হাওয়া ঢুকে পড়ে বুকে, সেখানে ধাক্কা লাগলে, ক্রাক ডাউনের রাত কেটে ভোর হলে মিলিটারির গুলিতে এ মসজিদের ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিল মুয়াজ্জিন সাহেব। ঠান্ডা হাওয়ার ধোক্কা রেইনকোটের তোপে একটাই গরম হয়ে ওঠে যে, মনে হয় ভিতরে বুঝি আগুন ধরে গেল। মসজিদের উল্টোদিকের বাড়িতে তিন তলায় থাকত তখন তারা। রাতভর ট্যাঙ্কের হুঙ্কার আর মেশিনগান আর স্টেনগানের ঘেউঘেউ আর মানুষের কাতরানিতে তাদের কারও ঘুম হয়নি সে রাতে। ছেলেমেয়ে নিয়ে ছেলেমেয়ের মায়ের সঙ্গে সে শুয়েছিল খাটের নিচে। ভোরবেলা মিলিটারি মানুষ মারায় একটু বিরতি দিয়ে ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়ে এবং বন্ধ জানালার পর্দা একটু তুলে সে রাস্তা দেখতে থাকে। রাস্তার ওপরে মসজিদের ছাদে মোয়াজ্জিন সাহেব দাঁড়িয়ে ছিল আজান দিতে। সাধারণত জুমার নামাজটা সে নিয়মিত পড়ে। তবে সেই ভোরে তার আজান শুনতে ইচ্ছা করছিল খুব। মোয়াজ্জিনের আজান দেওয়াটা সম্পূর্ণ দেখবে বলে সে জানালার ধার থেকে সরে না। সারা এলাকায় ইলেকট্রিসিটি নষ্ট, মসজিদে মাইক্রোফোন অকেজো।

মোয়াজ্জিন সাহেব গমগমে গলায় যতটা পারে জোর দিয়ে বলে উঠল ‘আল্লাহ আকবার’ । দ্বিতীয়বার আল্লাহর মহত্ত ঘোষণা করার সুযোগ তার আর মেলেনি, এর আগেই সম্পূর্ণ অন্যরকম ধ্বনি করে লোকটা পড়ে যায় রাস্তার ওপর। সেদিন সকালে বৃষ্টি ছিল না। আজ বৃষ্টির সকালে মিলিটারি কি ওই দৃশ্যের পুনর্ঘটনের পাঁয়তারা করছে? এখন তো কোনো নামাজের ওয়াক্ত নেই, তবে আজান দেওয়াবে কী করে? এর বোধ হয় যে কোনো সময়কেই নামাজের ওয়াক্ত ঘোষণা করে নুতন হুকুম জারি করেছে।

.

মূলরচনা-৮

.

মিলিটারি এখন যাবতীয় গাড়ি থামাচ্ছে গাড়ির পাসেঞ্জারদের নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় রাস্তার ধারে। আরেক দল মিলিটারি স্টেনগান তাক করিয়ে রাখছে এই মানুষের সারির ওপর। অন্য একটি দল ফের ওই সব লোকের জামাকাপড় ও শরীরের গোপন জায়গাগুলো তল্লাসি করে। মিলিটারি যাদের পছন্দ করছে তাদের ঠেলে দিচ্ছে পেছনে দাঁড়ানো একটা লরির দিকে। তাদের বাসটিতে এসে উঠল লম্বা ও খুব ফর্সা এক মিলিটারি।

এখন বাসের ভিতর কোনো আওয়াজ নাই। যাত্রীদের বুকের টিপটিপ শব্দ এই নীরবতার সুযোগ বাড়ে এবং এটাই তার মাথায় বাজে দ্রাম দ্রাম করে। বারান্দাওয়ালা টুপির নিচে শব্দের ঘষায় ঘষায় আগুন জ্বলে এবং তার হালকা বেরোয় তার চোখ দিয়ে তবে একটু নড়ে বসলে মাথার ও বুকের ধ্বনি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং এসবকে পরোয়া না করে সে সরাসরি তাকাল মিলিটারির মুখের দিকে।

মিলিটারির চোখ ছুঁচালো হয়ে আসে এবং ছুঁচালো চোখের মণি কাটার মতো বিঁধে যায় তার মুখে। সেও তার চোখের ভোঁতা কিন্তু গরম চাউনিটাকে স্থির করে আলগোছে বিছিয়ে দেয় মিলিটারির খাড়া নাকে. ছুটলো চোখে, গোঁফের নিচে ও নাক, গোঁফ ও চোখের আশপাশের ও নিচের লালচে চামড়ায়। এতে কাজ হলো। মিলিটারির চোখা চোখ সরে যায় তার মুখ থেকে নেমেড় পড়ে তার রেইনকোটের ওপর। মেন হয় রেইনকোটের পানির ফোঁটাগুলো লোকটা গুণে গুণে দেখছে। ভেতরের তাপে এইসব পানির ফোঁটা দেখে মিলিটারির এত থ মেরে যাবার কী হলো? লোকটা কি এগুলোতে রক্তের চিহ্ন দেখে? রেইনকোটের বৃষ্টির ফোঁটা গোণাগুনতি সেরে মিলিটারি হঠাৎ বলে 'আগে বাঢ়ো' বাস হঠাৎ স্টার্ট দিয়ে কয়েক পা লাফিয়ে আগে বাড়ে এবং যাত্রীদের স্বস্তি নিঃশ্বাসের ধাক্কায় অতিরিক্ত বেগে ছুটে পার হয়ে যায় ঢাকা কলেজের গেট। নিউ মার্কেটের সামনে এসে পড়লে সে উঠে দাঁড়ায়। এবং হুকুম করে, রাখেন নামবো। বাস একটু স্লো হলে তার রেইনকোটের জমানো পানি গড়িয়ে পড়তে দিয়ে অপারাধীমুক্ত বাস থেকে নামতে নামতে সহযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে সে ঠোঁট বাঁকায়, এতে তার সামনেরে সারির দাঁতও বেরিয়ে পড়ে। যারা দেখেছে তারা তার সেই ভঙ্গিটিকে ঠিক হাসি বলে শনাক্ত করতে পেরেছিল বলে তার ধারণা হয়।

.

মূলরচনা-৯

.

প্রিন্সিপালের কামরায় প্রিন্সিপালের সিংহাসন মার্কা চেয়ারে বসে রয়েছে জাঁদরেল টাইপের এক মিলিটারি পান্ডা। তার ভারিক্কি মুখ থেকে অনুমান করা যায়, পান্ডাটি কর্নেল কিংবা মেজর জেনারেল, অথবা মেজর বা ব্রিগেডিয়ার। তাকে দেখে

প্রিন্সিপালের কালো মুখ বেগুনি হয, ড. আফাজ আহমদ এমএসসি, পিএইচডি, ইপিএসইএস হওয়ার চেষ্ট করতে করতে স্যার বলে, হি ইজ প্রফেসর হুদা। কিন্তু ড. আফাজ আহমদ এমএসসি, পিএইচডি নিজে ভুল সংশোধন না করে পারে না, 'সরি হি ইজ নট এ প্রফেসর। এ লেকচারার ইন কেমিস্ট্রি। শাট আপ।' এবার প্রিন্সিপাল থামে। তাকে এবং আবদুল সাত্তার মৃধাকে মিলিটারি জিপে নিয়ে তোলার আগে জাদরেল কর্নেল না বিগ্রেডিয়ার প্রিন্সিপালকে কড়া গলায় বলে, সেনাবাহিনীকে নিয়ে মজা করে শায়েরি করা খুব বড়ো অপরাধ। এবার তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো তবে কড়া ওয়াচে রাখা হবে। উর্দুর প্রফেসর আকবর সাজিদের দোহাই পেড়ে প্রিন্সিপালের সুবিধা হয় না। নুরুল উদ্বিগ্ন হয়, সাজিদ সাহেব যদি পালিয়ে না থাকে তো তার কপালে যে কী আছে তা জানে এক আল্লা আর জানে এই মিলিটারি।

তাদের দুজনের চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, জিপ চলছিল এঁকেবেঁকে। মস্ত উঁচু একটা ঘরে তাদের এনে ফেলা হলো। চোখ খুলে দিলে সে আবদুস সাত্তার মৃধাকে দেখতে পায় না। জায়গাটাও একেবারে অচেনা। একটা ডেক চেয়ারে সে যে কতক্ষণ বসে থাকল তার কোনো হিসাব নেই। তার সামনে একটা চেয়ারে এসে বসল এক মিলিটারি। তাকে ইংরেজিতে নানান প্রশ্ন করলে, সে জবাব দেয়। লোকটা চলে গেলে তাকে অন্য ঘরে নিয়ে ফের অন্য একটা লোক এসে তাকে প্রশ্ন করে এবং সে জবাব দেয়। প্রশ্নগুলো প্রায় একইরকম এবং তার উত্তরেরও হেরফের হয় না। যেমন, কিছুদিন আগে তাদের কলেজে কয়েকটা লোহার আলমারি কেনা হয়েছে। ওগুলো বয়ে নিয়ে এসেছিল কারা?

সে জবাব দেয়, ঠিক। অফিসের জন্যে তিনটে, বোটানি হিস্ট্রি জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের জন্যে দুটো করে এবং ইংরেজির জন্যে একটা সর্বমোট দশটি আলমারি কলেজে নিয়ে আসা হয়েছে।

এত কথা বলার দরকার নাই তার। ওই আলমারিগুলো নিয়ে আসা হয় কয়েকটা ঠেলাগাড়ি করে ঠেলাগাড়িওয়ালাদের তো সে ভালো করেই চেনে। নুরুল হুদা জবাব দেয়, তাদের সে চিনবে কোথেকে? তারা হলো কুলি, সে একজন লেকচারার। তাহলে সে তাদের সঙ্গে এত কথা বলছিল কেন? প্রিন্সিপালের আদেশে সে আলমারিগুলোর স্টিলের পাতের ঘনত্ব, দেরাজের সংখ্যা ও আকার তালাচাবির মান, রঙের মান প্রভৃতি পরীক্ষা করে দেখছিল, তার দায়িত্ব ছিল-। মিলিটারি শান্ত গলায় তথ্য সরবরাহ করার ভঙ্গিতে বলে, মিসক্রিয়েন্টরা কলেজে ঢুকেছিল কুলির বেশে এটা তার চেয়ে আর ভালো জানে কে? তারা আজ ধরা পড়ে নুরুল হুদার নাম বলেছে। তাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিয়মিত, সে গ্যাঙের একজন সক্রিয় সদস্য।

.

মূলরচনা-১০

.

 ‘আমার নাম? সত্যি বলেছ? আমার নাম বলেছে?’ নুরুল হুদার হঠাৎ চিৎকোরে মিলিটারি বিরক্ত হয় না, বরং উৎসাহ পায়। উৎসাহিত মিলিটারি ফের বলে, কুলিরা ছিল ছদ্মবেশী মিসক্রিয়েন্ট। তারা কলেজের টিচারদের মধ্যে নুরুল হুদার নামই বলেছে। নুরুল হুদা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারা কি তাকে চেনে? কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট আলমারি সাজিয়ে রাখার সময় এক কুলি দাঁড়িয়েছিল তার গা ঘেষে। তখন তো ঘোরতর বর্ষাকাল, ঢাকায় এবার বৃষ্টিও হয়েছে খুব। রাতদিন এই বৃষ্টি

নিয়ে সে কি যেন বলেছিল, তাতে কুলিটা বিড়বিড় করে ওঠে, ‘বর্ষাকলেই তো জুৎ’ । কথাটা দুবার বলেছিল। এর মানে কী? স্টাফরুমে কে একজন একদিন না দুদিন ফিসফিস করছিল, বাংলার বর্ষা তো শালারা জানে না। বরাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইনটার, আমাদের জেনারেল মনসুর। -ওই ছদ্মবেশী ছেলেটা কি এই কথাই বুঝিয়েছিল? তার ওপর তাদের এত আস্থা? উৎসাহে নুরুল হুদা এদিক-ওদিক তাকায়। তার মৌনতা মিলিটারিকে আরেকটু নিশ্চিত করে।

কিছুক্ষণ পর কতক্ষণ পর সে বুঝতে পারে না, মিলিটারি তাকে ফের একই প্রশ্ন করে জবাব না পেয়ে প্রবল বেগে দুটো ঘুষি লাগায় তার মুখে। প্রথম ঘুষিতে সে কাত হয়, দ্বিতীয় ঘুষিতে পড়ে যায় মেঝেতে। মেঝে থেকে তুলে তাকে মিলিটারি ফের জিজ্ঞেস করে, ওদের আস্তানা কোথায় সে খবর তার তো ভালোভাবেই জানা আছে। সে জবাব দেয়, ‘হ্যাঁ’ ।

ওই ঠিকানাটা বলে দিলেই তো তাকে সসম্মানে ছেড়ে দেওয়া হবে এই নিশ্চয়তা দিয়ে তাকে পাউরুটি ও দুধ খাওয়ানো হয়। তাকে ভাবতে সময় দিয়ে মিলিটারি চলে যায়। কিছুক্ষণ পর, কতক্ষণ সে জানে না, মিলিটারি ফিরে এসে ফের বলে, মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা তো তার জানা আছে। সে ফের জবাব দেয় ‘হ্যাঁ’ । কিন্তু পরের প্রশ্নের জবাব না পেয়ে মিলিটারি তাকে নিয়ে যায় অন্য একটি ঘরে তার বেঁটেখাটো শরীরটাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো ছাদে-লাগানো একটা আংটার সঙ্গে। তার পাছায় চাবুকের বাড়ি পড়ে সপাৎ সপাৎ করে। তবে বাড়িগুলো বিরতিহীন পড়তে থাকায় কিছুক্ষণের মধ্যে সেগুলো নুরুল হুদার কাছ মনে হয় স্রেফ উৎপাত বলে। মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টি পড়ছে মিন্টুর রেইনকোটের ওপর। রেইনকোটটা এরা কূলে ফেলেছে, কোথায় রাখল কে জানে, কিন্তু তার ওম তার শরীরে এখনো লেগেই রয়েছে। বৃষ্টির

মতো চাবুকের বাড়ি পড়ে তার রেইনকোটের মতো চামড়ায় আর সে অবিরাম বলেই চলে, মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা তার জানা আছে। শুধু তার শালার নয়, তার ঠিকানা জানার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নাই, সে ছদ্মবেশী কুলিদের আস্তানাও চেনে। তারাও তাকে চেনে এবং তার ওপর তাদের আস্থাও কম নয়। তাদের সঙ্গে তার আঁতাতের অভিযোগ ও তাদের সঙ্গে তার আঁতাত রাখার উত্তেজনায় নুরুল হুদার ঝুলন্ত শরীর এতটাই কাপে যে চাবুকের বাড়ির দিকে তার আর মনোযোগ দেওয়া হয়ে ওঠে না।

শব্দার্থ ও টীকা

==============

[illegible] জেনারেল স্টেটমেন্ট - সাধারণ বিবৃতি।

[illegible] স্পেসিফিক ক্লাসিফিকেশন -সুনির্দিষ্ট শ্রেণিকরণ।

[illegible] তলব কিয়া। আভি যানা হোগা। - তলব করেছেন। এখনই যেতে হবে।

[illegible] মিসকিরিয়ান লোগ ইলেকটিরি টেরানসফর্মার তোড় দিয়া। অওর ওয়াপস যানে কা টাইম পিরিনসিপাল সাহাবকা কোঠিমে গেরেনড ফেকা। গেট তোড় গিয়া।- মসিক্রিয়েনটরা ইলেকট্রিক ট্রান্সফার উড়িয়ে দিয়েছে। আবার ফিরে যাওয়ার সময় প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের বাড়িতে গ্রেনেড ছুঁড়েছে। গেট ভেঙে গেছে।

[illegible] ক্যায়সে?- কীভাবে?

[illegible] উও আপ হি কহ সকতা- সেটি আপনিই বলতে পারেন।

[illegible] মিসক্রিয়ান্ট - দুষ্কৃতকারী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকার ও তার সেনাবহিনী এই শব্দটি বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ব্যবহার করেছে।

[illegible] আব্দুস সাত্তার মিরাধাকা ঘর যানে হোগা। আপ আভি আইয়ে। এক কর্ণেল সাহাব পঁওছ গিয়া। সব পরফসরকো এত্তলা দিয়া। ফওরন আইয়ে - আবদুস সাত্তার মৃধার বাসায় যেতে হবে। আপনি এখনই আসুন। এক কর্নেল সাহেব এর মধ্যে চলে এসছেন। সব প্রফেসরকে ডেকেছেন। তাড়াতাড়ি আসুন।

[illegible] ওয়েডিং ওয়ার্কশপ।- ঝালাই কারখানা।

[illegible] সাবর্ভাসিব অ্যাকটিভিটিজ - রাষ্ট্র বিরোধী কার্যক্রম। মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতাকে পাকিস্তান সরকার ও তাদের সমর্থকরা ১৯৭১ সালে এভাবে অভিহিত করত।

[illegible] ট্রান্সপারেন্ট - স্বচ্ছ

[illegible] ক্রাক-ডাউনের রাত- ১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকায় যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যা পরিচালনা করে সেই রাতের কথা বলা হয়েছে।

[illegible] রাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইন্টার আমাদের জেনারেল মনসুন- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রচণ্ড শীতের কবলে পড়ে হিটলারের বাহিনী রুশ বাহিনীর হাতে পর্যুদুস্ত

হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রবল বর্ষায় তেমনি বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়েছিল হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী। এখানে সেই বিষয়টিরই তুলনা করা হয়েছে।

-

পাঠ-পরিচিতি

===============

'রেইনকোট' গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে। পরে এটি লেখকের সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' (১৯৯৭) গ্রন্থে সংকলিত হয়। এ গল্পের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র ১ থেকে। মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ে গল্পটি রচিত। মুক্তিযুদ্ধের তখন শেষ পর্যায়। ঢাকায় তখন মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণ শুরু হয়েছে। তারই একটি ঘটনা এ গল্পের বিষয়; যেখানে ঢাকা কলেজের সামনে গেরিলা আক্রমণের ফলে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কলেজের শিক্ষকদের তলব করে এবং তাদের মধ্য থেকে নুরুল হুদা ও আবদুস সাত্তার মৃধাকে গ্রেপ্তার করে নির্যাতন চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা করে। নুরুল হুদা এই গল্পের কথক। তার জবানিতে গল্পের ঘটনাবলি বিবৃত হয়েছে। বিবৃত হয়েছে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের মধ্যে ঢাকা শহরের আতঙ্কগ্রস্ত জীবনের চিত্র। গেরিলা আক্রমণের ঘটনা ঘটে যে রাতে, তার পরদিন সকালে ছিল বৃষ্টি। তলব পেলে সেই বৃষ্টির মধ্যে নুরুল হুদাকে কলেজে যেতে যে রেইনকোটটি পরতে হয় সেটি ছিল তার শ্যালক মুক্তিযোদ্ধা মন্টুর। গল্পে এই রেইনকোটের প্রতীকী তাৎপর্য অসাধারণ। মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট গায়ে দিয়ে সাধারণ ভীতু

প্রকৃতির নুরুল হুদার মধ্যে সঞ্চারিত হয় যে উষ্ণতা, সাহস ও দেশপ্রেম- তারই ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ ঘটেছে এ গল্পে।

মহাজাগতিক কিউরেটর

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

লেখক পরিচিতি

মুহম্মদ জাফর ইকবাল ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৩এ ডিসেম্বর পিতার কর্মস্থল সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শহিদ ফয়জুর রহমান আহমেদ, জননী আয়েশা আখতার খাতুন। মুহম্মদ জাফর ইকবালের পৈতৃক নিবাস নেত্রকোনা জেলায়। তাঁর মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয় বগুড়ায়। ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পাসের পর তিনি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। দীর্ঘ প্রবাসজীবন শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়পক পদে নিযুক্ত হন।

.

মুহম্মদ জাফর ইকবাল বাংলা ভাষায় রচিত সায়েন্স ফিকশন বা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির একচ্ছত্র সম্রাট। 'কপোট্রনিক সুখ দুঃখ' রচনার মাধ্যমে এ-ধারার সাহিত্য তাঁর প্রথম আবির্ভাব। বিজ্ঞানকে উপলক্ষ্য করে কল্পনার বিস্তারে অসামান্যতা তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তিনি একই সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও স্বপ্নচারী রোমান্টিক। তাঁর সাহিত্যে ও বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠা ও মানবীয় কল্পনার সম্মিলন ঘটেছে। মাতৃভূমি, মানুষ ও ধরিত্রীর প্রতি নৈতিকতা দায়বদ্ধতা তাঁর সাহিত্যিক মানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের বিজ্ঞানমুখী তরুণ-প্রজন্মের তিনি আইডল বা আদর্শ। কিশোর উপন্যাস এবং ছোটগল্প রচনাতেও তিনি দক্ষতার সাক্ষর রেখেছেন। কিশোর উপন্যাস 'দীপু নাম্বার টু', 'আমার বন্ধু রাশেদ' এবং 'আমি তপু' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। 'মহাকাশে মহাত্রাস', 'টুকুনজিল', 'নিঃসঙ্গ গ্রহচারী', 'একজন আতিমানবী', 'ফোবিয়ানের যাত্রী' সহ অনেক পাঠকপ্রিয় সায়েন্স ফিকশন বা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির তিনি সৃষ্টা। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞান লেখক হিসেবে তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।

.

মূলরচনা-১

সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তারা বেশ সন্তুষ্ট হলো। প্রথম প্রাণীটি বলল, এখানে প্রাণে বিকাশ হয়েছে। হ্যাঁ। বেশ পরিণত প্রাণ। অনেক ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রজাতি। একেবারে ক্ষুদ্র এককোষী থেকে শুরু করে লক্ষ-কোটি কোষের প্রাণী। দ্বিতীয় প্রাণীটি আরও একটু খুটিয়ে দেখ বলল, না। আসলে এটি জটিল প্রাণ নয়। খুব সহজ এবং সাধারণ। কেন? সাধারণ কেন বলছ? তাকিয়ে দেখ কত ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রাণ। শুরু হয়েছে ভাইরাস থেকে, প্রকৃতপক্ষে ভাইরাস আলাদাভাবে প্রাণহীন বলা যায়। অন্য কোনো প্রাণীর সংস্পর্শে এলেই তার মাঝে জীবনের লক্ষণ দেখা যায়। তারপর রয়েছে এককোষী প্রাণ, পরজীবী ব্যাকটেরিয়া। তারপর আছে গাছপালা, এক জায়গায় স্থির। আলোকসংশ্লেষণ দিয়ে নিজের খাবার নিজেই তৈরি করে নিচ্ছে। পদ্ধতিটা বেশ চমৎকার। গাছপালা ছাড়াও আছে কীটপতঙ্গ। তাকিয়ে দেখ কত রকম কীটপতঙ্গ। পানিতেও নানা ধরনের প্রাণী আছে, তাদের বেঁচে থাকার পদ্ধতি ভিন্ন। ডাঙাতেও নান ধরনের প্রাণী, কিছু কিছু শীতল রক্তের কিছু কিছু উষ্ণ রক্তের। উষ্ণ রক্তের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একটির ভিতের আবার অত্যন্ত নিম্নশ্রেণির বুদ্ধির বিকাশ হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছ। কিন্তু সব আসলে বাহ্যিক। এই ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মাঝে আসলে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। প্রথম প্রাণীটি বলল, আমি বুঝতে পারছি না, তুমি কেন এই পার্থক্যকে বাহ্যিক বলছ। তুমি আরেকটু খুঁটিয়ে দেখ। এই ভিন্ন প্রজাতি কী দিয়ে তৈরি হয়েছে দেখ। প্রথম প্রাণীটি একটু খুঁটিয়ে দেখে বিস্ময়সূচক শব্দ করে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। এই প্রাণীগুলো একইভাবে তৈরি হয়েছে। সব প্রাণীর জন্য মূল গঠনটি হচ্ছে ডিএনএ দিয়ে, সব প্রাণীর ডিএনএ একই রকম, সবগুলো একই বেস পেয়ার দিয়ে তৈরি। সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে জটিল প্রাণীটির একই রকম গঠন। প্রাণীটির বিকাশের

নীলনকশা এই ডিএন এ দিয়ে তৈরি করে রাখা আছে। কোনো প্রাণীর নীলনকশা সহজ, কোনো প্রাণীর নীলনকশা জটিল এইটুকুই হচ্ছে পার্থক্য।

.

মূলরচনা-২

.

'হ্যা' । দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রানীগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছি-কাজটি সহজ নয়। এই গ্রহণ থেকেও সর্বশ্রেষ্ট প্রাণীটি খুঁজে বের করতে হবে-যেহেতু সবগুলো প্রাণীর গঠন একই রকম, কাজটি আরও কঠিন হয়ে গেল। সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করে দেওয়া যাক। হ্যাঁ। এই ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়া বেশি ছোট, এর গঠন এত সহজ এর মাঝে কোনো বৈচিত্র্য নেই। হ্যাঁ। ঠিকই বলেছ। আবার এই হাতি বা নীল তিমি নিয়েও কাজ নেই, এদের আকার বেশি বড়। সংরক্ষণ করা কঠিন হবে। গাছপালা নেওয়ারও প্রয়োজন নেই। এরা এক জায়গায় স্থির থাকে। যেখানে গতিশীল প্রাণী আছে সেখানে স্থির প্রাণ নেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। এই প্রাণীটি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? একটাকে বলে সাপ। সাপটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু এটা সরীসৃপ। সরীসৃপের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত নয়, ঠান্ডার মাঝে এরা কেমন যেন স্থবির হয়ে পড়ে। প্রাণিজগতে সরীসৃপ একটু পিছিয়ে পড়া প্রাণী। ঠিকই বলেছ। তা হলে সরীসৃপ নিয়ে কাজ নেই। প্রথম প্রাণীটি বলল, আমার প্রাণীটি খুব পছন্দ হয়েছে। এটাকে বলে পাখি। কী চমৎকার! আকাশে উড়তে পারে! দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, আমার এটি খুব পছন্দ হয়েছে। দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, হ্যাঁ, আমারও এটি পছন্দ হয়েছে। আমরা এই প্রাণীকে নিতে পারি। তবে-তবে কী? এদের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আমি খুব নিশ্চিত নই।

আমাদের কি এমন কোনো প্রাণী নেওয়া উচিত নয় যারা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে, যারা কোনো ধরনের সভ্যতা গড়ে তুলেছে? ঠিকই বলেছ। তা হলে আমাদের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একবার দেখা উচিত। এই দেখ একটা স্তন্যপায়ী প্রাণী। কী সুন্দর হলুদের মাঝে কালো ডোরাকাটা! এর নাম বাঘ। ‘হ্যাঁ’ প্রাণীটি চমৎকার। কিন্তু ও এটি একা একা থাকতে পছন্দ কর। একটা সামাজিক প্রাণী নিতে পারি না? কুকুরকে নিলে কেমন হয়? এরা একসাথে থাকে। দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। প্রথম প্রাণীটি বলল, এই প্রাণীকে মানুষ পোষ মানিয়ে রেখেছে, প্রাণী নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলছে। ঠিকই বলেছ।

.

মূলরচনা-৩

.

গৃহপালিত প্রাণীগুলোর মাঝে স্বকীয়তা লোপ পেয়ে যাচ্ছে। একটা খাঁটি প্রাণী নেওয়া প্রয়োজন হরিণ নিলে কেমন হয়? তৃণভোজী প্রাণী। তার অর্থ জান? কী? এদের দীর্ঘ সময় খেতে হয়। বেশির ভাগ সময় এটা ঘাস লতাপাতা খেয়ে কাটায়। ঠিকই বলেছ। আমরা দেখেছি কোনো প্রাণীই পছন্দ করতে পারছি না। আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে। কী? এই গ্রহে যে প্রাণীটি সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সেই প্রাণী নিলে কেমন হয়? কোন প্রাণীর কথা বলছ? মানুষ। মানুষ? ‘হ্যা’ । দেখ এদের একটা সামাজিক ব্যবস্থা আছে। সমাজবদ্ধ হয়ে থাকে। এদের কেউ শ্রমিক, কেউ সৈনিক, কেউ বুদ্ধিজীবী। ঠিকই বলেছ। এই দেখ এরা শহর বন্দর নগর তৈরি করেছে। কত বিশাল বিশাল নগর তৈরি করেছে। শুধু তাই না, দেখ এরা চাষাবাদ করছে।

পশুপালন করছে। যখন কোনো সমস্যা হয় তখন এরা দলবদ্ধভাবে সেটা সমাধান করার চেষ্ট করে। নিজেদের সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য এদের কত আত্মত্যাগ রয়েছে দেখেছে? কিন্তু আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে-কী? তুমি কী সত্যিই বিশ্বাস কর মানুষ এই গ্রহের শ্রেষ্ঠ প্রাণী? তুমি কেন এটা জিজ্ঞেস করছ? এই পৃথিবীর দিকে তাকাও। দেখেছ বাতাসে কত দূষিত পদার্থ? কত তেজস্ক্রিয় পদার্থ? বাতাসের ওজোন স্তর কেমন করে শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখেছ? গাছ কেটে কত বিস্তির্ণ এলাকা ধ্বংস করেছে দেখেছ? এর সবই কি মানুষ করেছে? হ্যাঁ কী আশ্চর্য! আমি ভেবেছিলাম এরা বুদ্ধিমান প্রাণী। এরা একে অন্যের ওপর নিউক্লিয়ার বোমা ফেলছে। যুদ্ধ করে একজন আরেকজনকে ধ্বংস করে ফেলছে। প্রকৃতিকে এরা দূষিত করে ফেলছে। ঠিকই বলেছে। প্রাণী দুটি কিছুক্ষণ বেশ মনোযোগ দিয়ে মানুষকে লক্ষ করল, তারপর প্রথম প্রাণীটি বলল, না মানুষকে নেওয়া ঠিক হবে না। এরা মাত্র দুই মিলিয়ন বছর আগে জন্ম নিয়েছে, কিন্তু এর মাঝেই শুধু যে নিজেদের বিপন্ন করেছে তাই নয়, পুরো গ্রহটিকে ধ্বংস করে ফেলার অবস্থা করে ফেলেছে। দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, মহাজাগতিক কাউন্সিল আমাদের কিউরেটরের দায়িত্ব দিয়েছে। আমাদের খুব চিন্তা ভাবনা করে প্রাণীগুলো বেছে নিতে হবে। এই সুন্দর গ্রহ থেকে এ রকম স্বেচ্ছা ধ্বংসকারী প্রাণী আমরা নিতে পারি না। কিছুতেই নিতে পারি না। প্রাণীটি দুটি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে এবং হঠাৎ করে প্রথম প্রাণীটি আনন্দের ধ্বনি দিয়ে ওঠে। দ্বিতীয় প্রাণীটি অবাক হয়ে বলল, কী হয়েছে? আমি একটি প্রাণী খুঁজে পেয়েছি। এরাও সামাজিক প্রাণী। এরাও দল বেঁধে থাকে। এদের মাঝে শ্রমিক আছে সৈনিক আছে। বংশ বিস্তারের জন্য চমৎকার একটা পদ্ধতি আছে। দেখ নিজেদের থাকার জন্য কী চমৎকার বিশাল বাসস্থান তৈরি করেছে! দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, ঠিকই বলেছ। দেখ এরাও মানুষের মতো চাষাবাদ করতে পারে। মানুষ যেরকম নিজেদের

সুবিধার জন্য পশুপালন করতে পারে এদেরও ঠিক সেরকম ব্যবস্থা রয়েছে। কী সুশৃঙ্খল প্রাণী দেখেছ?

.

মূলরচনা-৪

শুধু সুশৃঙ্খল নয়, এরা অসম্ভব পরিশ্রমী, গায়ে প্রচণ্ড জোর, নিজের শরীর থেকে দশগুণ বেশি জিনিস অনায়াসে নিয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ। কোনো ঝগড়াবিবাদ নেই। কে কোনো কাজ করবে আগে থেকে ঠিক করে রেখেছে। কোনো রকম অভিযোগ নেই যে যার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। অত্যন্ত সুবিবেচক। আগে থেকে খাবার জমিয়ে রাখছে। আর বিপদে কখনো দিশেহারা হয় না। অন্যকে বাঁচানোর জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়ে যাচ্ছে। মানুষের বয়স মাত্র দুই মিলয়ন বছর, সেই তুলনায় এরা সেই ডাইনোসরের যুগ থেকে বেঁচে আছে। প্রকৃতির এতটুকু ক্ষতি করেনি। আমি নিশ্চিত মানুষ নিজেদের ধ্বংস করে ফেলার পরও এরা বেঁচে থাকবে। পৃথিবী এক সময় এরাই নিয়ন্ত্রণ করবে।

.

ঠিকই বলেছ। তা হলে আমরা এই প্রাণীটাই নিয়ে যাই? হ্যাঁ পৃথিবীর এই চমৎকার প্রাণীটি নেওয়াই সবচেয়ে সুবিবেচনার কাজ হবে। দুজন মহাজাগতিক কিউরেটর সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটি থেঘকে কয়েকটি পিঁপড়া তুলে নিয়ে গ্যালাক্সির অন্য গ্রহ-নক্ষত্রে রওনরা দেয়, দীর্ঘদিন থেকে বিশ্বব্রহ্মা ঘুরে ঘুরে তারা গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ করছে।

'জলজ' গ্রন্থের অন্তর্গত æমহাজাগতিক কিউরেটর" গল্পটি মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'সায়েন্স ফিকশন সমগ্র' তৃতীয় খণ্ড (২০০২) থেকে গৃহীত হয়েছে। æমহাজাগতিক কিউরেটর" বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী হলেও এতে দেশকালের প্রভাবপুষ্ট মানবকল্যাণকর্মী লেখকের জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন ঘটেছে। অনন্ত মহাজগৎ থেকে আগত মহাজাগতিক কাউন্সিলের দুজন কিউরেটর এর বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর নমুনা সংগ্রহে সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ পৃথিবীতে আগমনের তথ্য দিয়ে গল্পটির সূচনা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়ে দুজন কিউরেটরের সংলাপ বিনিময়ের মধ্য দিয়ে গল্পটি নাট্যগুণ লাভ করেছে। প্রজাতির যাচাই-বাছাই কালে পৃথিবীর নানা প্রাণীর গুণাগুণ কিউরেটরদের সংলাপে উঠে আসে। 'মানুষ' নামক প্রজাতি বিবেচনার ক্ষেত্রে কিউরেটর দুজনের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা মূলত কল্পকাহিনীর লেখকেরও মনের কথা। দুজন কিউরেটর পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে মানুষের কারণেই হ্রাস ঘটে যাচ্ছে ওজোন স্তরের। মানুষই নির্বিচারে গাছ কেটে ধ্বংস করে চলেছে প্রকৃতির ভারসাম্য। পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে মানুষই নিউক্লিয়ার বোঝা ফেলছে একে অন্যের ওপর। এক পরিস্থিতিতেও তারা পৃথিবীর বুদ্ধিমান বলে কথিত। 'মানুষ' প্রজাতির নির্বুদ্ধিতায় তারা শঙ্কিত হয়। অবশেষে তারা পরিশ্রমী সুশৃঙ্খল সামাজিক প্রাণী পিঁপড়াকেই শনাক্ত করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রজাতি হিসেবে। ডাইনোসরের যুগ থেকে এখনো বেঁচে থাকা সুবিবেচক ও পরোপকারী পিঁপড়াকে তারা পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী বিবেচনায় সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। কল্পকাহিনির রসের সঙ্গে সমাজ, পরিবেশ ও পৃথিবী সম্পর্কে সচেতন লেখকের তীব্র শ্লেষ ও পরিহাসের মিশ্রণ গল্পটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

নেকলেস

গী দ্য মোপাসাঁ

লেখক পরিচিতি

গী দ্য মোপাসাঁ ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের ৫ই আগস্ট ফ্রান্সের নর্মান্ডি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম Henri- Renri-Albert-Guy de Maupassant। তাঁর পিতার নাম গুস্তাভ দ্যা মোপাসাঁ ও মায়ের নাম লরা লি পয়টিভিন (Laure Le poittevin)। ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে মোপাসাঁ একটি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক গুস্তাভ ফ্লবেয়ার-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।পারিবারিক বন্ধু গুস্তাব ফ্লবেয়ার মোপাসাঁর সাহিত্য-জীবনে অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই মহান লেখকের নির্দেশনা ও সহযোগিতায় তিনি সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেন। ফ্লবেয়ারের বাসায় মোপাসাঁর পরিচয় ঘটে এমিল জোলা ও ইভান তুর্গনেভসহ অনেক বিখ্যাত লেখকের সঙ্গে। কাব্যচর্চা দিয়ে তাঁর সাহিত্য-জীবন শুরু হলেও মূলত গল্পকার হিসেবে তিনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন। ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতি ও আদর্শগত কোনো বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত না হয়ে তিনি তাঁর সাহিত্য-চর্চার জগৎ তৈরি করেন। তাঁর বস্তুনিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার তুলনা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে খুব বেশি

লক্ষ করা যায় না। অসাধারণ সংযম ও বিস্ময়কর জীবনবোধ তাঁর রচনাকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। |

গী দ্য মোপাসাঁ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ই জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

.

অনুবাদক-পরিচিতি

পূর্ণেন্দু দস্তিদার চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলায় ধলঘাট গ্রামে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২০-এ জুন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে লেখক ও রাজনীতিবিদ। তাঁর পিতা চন্দ্রকুমার দস্তিদার ও মাতা কুমুদিনী দস্তিদার। তিনি মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে পরিচালিত চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহে অংশ নেওয়ায় কারাবরণ করেন। পেশাগত জীবনে তিনি ছিলেন আইনজীবী; সমাজ ভাবুক লেখক হিসেবেও খ্যাতি ছিল। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে: 'কবিয়াল রমেশ শীল' , 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম' , 'বীরকন্যা প্রীতিলতা' । এছাড়াও তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'শেখভের গল্প' ও 'মোপাসাঁর গল্প' । তিনি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৯ই মে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে ভারতে যাওয়ার পথে মৃত্যুবরণ করেন।

.

মূলরচনা-১

সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী। নিয়তির ভুলেই যেন এক কেরানির পরিবারে তার জন্ম হয়েছে। তার ছিল না কোনো আনন্দ, কোনো আশা। পরিচিত হবার, প্রশংসা পাওয়ার, প্রেমলাভ করার এবং কোনো ধনী অথবা বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে বিবাহিত হওয়ার কোনো উপায় তার ছিল না। তাই শিক্ষা পরিষদ আপিসের সমান্য এক

কেরানির সঙ্গে বিবাহ সে স্বীকার করে নিয়েছিল। নিজেকে সজ্জিত করার অক্ষমতার জন্য সে সাধারণভাবেই থাকত। কিন্তু তার শ্রেণির অন্যতম হিসেবে সে ছিল অসুখী। তাদের কোনো জাতিবর্ণ নেই। কারণ জন্মের পরে পরিবার থেকেই তারা শ্রী, সৌন্দর্য ও মাধুর্য সম্পর্কে সজাগ হেয় ওঠে। সহজাত চাতুর্য, প্রকৃতিগত সুরুচিপূর্ণ ও আর বুদ্ধির নমনীয়তাই হলো তাদের আভিজাত্য, যার ফলে অনেক সাধারণ পরিবারের মেয়েকেও বিশিস্ট মহিলার সমকক্ষ করে তোলে। সর্বদা তার মনে দুঃখ। তার ধারণা, যত সব সুরুচিপূর্ণ ও বিলাসিতার বস্তু আছে, সেগুলির জন্যই তার জন্ম হয়েছে। তার বাসকক্ষের দারিদ্র, হতশ্রী, দেওয়াল, জীর্ণ চেয়ার এবং বিবর্ণ জিনিসপত্রের জন্য সে ব্যথিত হতো। তার মতো অবস্থার অন্য কোনো মেয়ে এসব জিনিস যদিও লক্ষ করত না, সে এতে দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হতো। যে খর্বকায় ব্রেটন এই সাধারণ ঘরটি তৈরি করেছিল তাকে দেখলেই তার মনে বেদনাভরা দুঃখ আর বেপরোয়া সব স্বপ্ন জেগে উঠত। সে ভাবত তার থাকবে প্রাচ্য-চিত্র শোভিত, উষ্চ ব্রোঞ্জ-এর আলোকমণ্ডিত পার্শ্বকক্ষ। আর থাকবে দুজন বেশ মোটাসোটা গৃহ-ভৃত্য। তারা খাটো পায়জামা পরে যে বড় আরামকেদারা দুটি গরম করার যন্ত্র থেকে বিক্ষিপ্ত ভারি হওয়ায় নিদ্রালু হয়ে উঠেছে, তাতে শুয়ে ঘুমিয়ে থাকবে। সে কামনা করে একটি বৈঠকখানা, পুরানো রেশমি পর্দা সেখানে ঝুলবে। থাকবে তাতে বিভিন্ন চমৎকার আসবাব, যার ওপর শোভা পাবে অমূল্য সব প্রাচীন কৌতূহল উদ্দীপক সামগ্রী। যেসব পরিচিত ও আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ সব মেয়েদের কাম্য, সেসব অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে বিকাল পাঁচটায় গল্পগুজব করবার জন্য ছোট সুরভিত একটি কক্ষ সেখানে থাকবে।

.

তিনদিন ধরে ব্যবহৃত একখানা টেবিলক্লথ ঢাকা গোল একটি টেবিলে তার স্বামীর বিপরীত দিকে সে যখন সান্ধ্যভোজে বসে এবং খুশির আমেজে তার স্বামী বড় সুরুয়ার পাত্রটির ঢাকনা তুলতে বলে, ও! কি ভালো মানুষ! এর চেয়ে ভালো কিছু আমি চাই না- তখন তার মনে পড়বে আড়ম্বরপূর্ণ সান্ধ্যভোজের কথা, উজ্জ্বল রৌপ্যপাত্রাদি, মায়াময় বনভূমির মধ্যে প্রাচীন বিশিস্ট ব্যক্তি ও বিরল পাখির চিত্রশোভিত কারুকার্যপূর্ণ পর্দা দিয়ে ঢাকা দেওয়াল-এর কামনা। সে ভাবে, অপরূপ পাত্রে পরিবেশিত হবে অপূর্ব খাধ্য আর গোলাপি রং-এর রোহিত মাছের টুকরা অথবা মুরগির পাখনা খেতে খেতে মুখে সিংহ-মানবীর হাসি নিয়ে কান পেতে শুনবে চুপি-চুপি-বলা প্রণয়লীলার কাহিনি।

.

মূলরচনা-২

.

তার কাছে ফ্রক বা জড়োয়া গহনা নেই-নেই বলতে কিছু নেই। অথচ ঐ সব বস্তুই তার প্রিয়। তার ধারণা ঐসবের জন্যই তার সৃষ্টি সুখী করার, কাম্য হওয়ার, চালাক ও প্রনয়যাচিকা হবার কতই না তার ইচ্ছা। তার ‘কনভেন্ট’ -এর সহপাঠিনী এক ধনী বান্ধবী ছিল। তার সঙ্গে দেখা করতে তার ভালো লাগত না। কারণ দেখা করে ফিরে এসে তার খুব কষ্ট লাগত। বিরক্তি, দুঃখ, হতাশা ও নৈরাশ্যে সমস্ত দিন ধরে সে কাদঁত। এক সন্ধ্যায় হাতে একটি বড় খাম নিয়ে বেশ উল্লাসিত হয়ে তার স্বামী ঘরে ফিরল। সে বলল, ‘এই যে, তোমার জন্য এক জিনিস এনেছি।’ মেয়েটি তাড়াতাড়ি খামটি ছিড়ে তার ভিতর থেকে একখানা ছাপানো কার্ড বের করল। তাতে নিচের কথাগুলি মুদ্রিত ছিল: ‘জনশিক্ষা মন্ত্রী ও মাদাম জর্জ রেমপননু আগামী ১৮ই জানুয়ারি সন্ধ্যায় তাহাদের নিজ বাসগৃহে মসিঁয়ে ও মাদাম লোইসেলের উপস্থিতি কামনা করেন।

’ তার স্বামী যেমন আশা করেছিল তেমনভাবে খুশি হওয়ার পরিবর্তে মেয়েটি বিদ্বেষের ভাব নিয়ে আমন্ত্রণ লিপিখানা টেবিলের উপর নিক্ষেপ করে, বিড় বিড় করে বলে, ‘ওখানা নিয়ে তুমি আমায় কী করতে বল?’ কিন্তু লক্ষ্মীটি, আমি ভেবেছিলাম, এতে তুমি খুশি হবে। তুমি বাইরে কখনও যাও না, তাই এই এক সুযোগ চমৎকার এক সুযোগ! এটা জোগাড় করতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। সবাই একখানা চায়, কিন্তু খুব বেছে বেছে দেওয়া হচ্ছে। কর্মচারীদের বেশি দেওয়া হয়নি। সেখানে তুমি গোটা সরকারি মহলকে দেখতে পাবে। বিরক্তির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি অধীরভাবে বলে উঠল; ঐ ঘটনার মতো একটি ব্যাপার কি পরে আমি যাব বলে তুমি মনে কর? সে ঐ সম্পর্কে কিছু ভাবেনি। তাই সে বিব্রতভাবে বলে, কেন আমরা থিয়েটারে যাবার সময় তুমি যেই পোশাকটা পর সেটা পরবে। ওটা আমার কাছে খুব সুন্দর লাগে-তার স্ত্রীকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে সে আতঙ্কে নির্বাক ও হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তার চোখের পাশ থেকে বড় দুফোঁটা অশ্রু তার গালের উপর গড়িয়ে পড়ল। সে থতমতভাবে বলল: কী হলো? কী হলো তোমার? প্রবল চেষ্টায় মেয়েটি নিজের বিরক্তি দমন করে, তার সিক্ত গা মুছে ফেলে শান্ত কন্ঠে জবাব দেয়। কিছুই না। শুধু আমার কোনো পোশাক নেই বলে আমি ঐ ব্যাপারে যেতে পারব না। তোমার যে কোনো সহকর্মীর স্ত্রীর পোশাক আমার চেয়ে যদি ভালো থাকে, কার্ডখানা নিয়ে তাকে দাও। সে মনে মনে দুঃখ পায়। তারপর সে জবাব দেয় : মাতিলদা, বেশ তো চল আলাপ করি আমরা। এমন কোনো পোশাক অন্য কোনো উপলক্ষেও যা দিয় কাজ চলবে অথচ বেশ সাদাসিধা, তার দাম কত আর হবে? কয়েক সেকেন্ড মেয়েটি চিন্তা করে দেখে এমন একটি সংখ্যার বিষয় স্থির করল যা চেয়ে বসলে হিসাবি কেরানির কাছ থেকে সঙ্গে সঙ্গে এক আতঙ্কিত প্রত্যাখান যেন না আসে। শেষপর্যন্ত ইতস্তত করে, মেয়েটি বলল : আমি ঠিক বলতে পারছিনা, তবে আমার মনে হয় চারশ ফ্রা হলে তা

কেনা যাবে। শুনে তার মুখ ম্লান হয়ে গেল। কারণ, তার যেসব বন্ধু গত রবিবার নানতিয়ারের সমভূতিতে ভরতপাখি শিকারে গিয়েছিল, আগামী গ্রীষ্মে তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ইচ্ছায় একটি বন্দুক কিনবার জন্য ঠিক ততটা অর্থই সে সঞ্চয় করেছিল। তা সত্ত্বেও জবাব দিল : বেশ ত। আমি তোমায় চারশত ফ্রা দেব। কিন্তু বেশ সুন্দর একটি পোশাক কিনে নিও। বল-নাচের দিন যতই এগিয়ে আসতে থাকে ততই মাদাম লোইসেলকে বিচলিত ও উদ্বিগ্ন মনে হয়। অবশ্য তার পোশাক প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে। একদিন সন্ধ্যায় তার স্বামী তাকে বলল : তোমার হয়েছে কী? গত দুই তিনদিন ধরে তোমার কাজকর্ম কেমন অদ্ভুত ঠেকছে। শুনে মেয়েটি জবাব দেয়। আমার কোনো মণিমুক্তা, একটি দামি পাথর কিছুই নেই যা দিয়ে আমি নিজেকে সাজাতে পারি। আমায় দেখলে কেমন গরিব গরিব মনে হবে। তাই এই অনুষ্ঠানে আমার না যাওয়াই ভালো হবে। স্বামী বলল, কিছু সত্যকার ফুল দিয়ে তুমি সাজতে পার।এই ঋতুতে তাতে বেশ সরুচিপূর্ণ দেখায়। দশ ফ্রাঁ দিলে তুমি দুটি কি তিনটি অত্যন্ত চমৎকার গোলাপফুল পাবে।

.

মূলরচনা-৩

.

মেয়েটি ঐ কথায় আশ্বস্ত হলো না। সে জবাবে বলল, না ধনী মেয়েদের মাঝখানে পোশাকে পরিচ্ছদে ঐ রকম খেলো দেখানোর মতো আর বেশি কিছু অপমানজনক নেই। তখন তার স্বামী চেঁচিয়ে উঠল : আচ্ছা কী বোকা দেখ আমরা! যাও, তোমার বান্ধবী মাদার ফোরসটিয়ারের সঙ্গে দেখা করে তাকে বল তার জড়োয়া গহনা যেন তোমায় ধার দেয়। এটুকু আদায় করার তো তার সঙ্গে তোমায় পরিচয় যথেষ্ট। সে

আনন্দধ্বনি করে উঠল। তারপর সে বলল : সত্যিই তো! এটা আমি ভাবিনি। পরদিন সে তার বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে তার দুঃখের কাহিনি তাকে বলল। মাদাম ফোরসটিয়ার তা কাচের দরজা লাগানো গোপনকক্ষে গিয়ে বড় একটি গহনার বাক্স বের করে এনে তা খুলে বলল : ভাই যা ইচ্ছা এখান থেকে নাও। সে প্রথমে দেখল কয়েকটি কঙ্কন, তারপর একটি মুক্তার মালা। ও মণিমুক্তা-খচিত চমৎকার কারুকার্য-ভরা-একটি সোনার ভিনিশাঁর 'ক্রশ' । আয়নার সামনে গিয়ে সে জড়োয়া গহনাগুলি পরে পরে দেখে আর ইতস্তত করে, কিন্তু ওগুলি নেওয়ার সিদ্ধান্তও করতে ছেড়ে যেতেও পারে না। তারপরও সে জিজ্ঞাসা করে : আর কিছু নেই তোমার? কেন? আছে, তোমার যা পছন্দ তুমি তা বেছে নাও। হঠাৎ সে কালো স্যাটিনের একটি বাক্সে দেখল অপরূপ একখানা হীরার হার। অদম্য কামনায় তার বুক দুর দুর করে। সেটা তুলে নিতে গিয়ে তার হাত কাপে। সে তার পোশাকের উপর দিয়ে সেটা গলায় তুলে নেয় এবং সেগুলো দেখে আনন্দে বিহ্বল হয়ে যায়। তারপর উদ্বগভরা, ইতস্তভাবে সে জিজ্ঞাসা করল : তুমি ঐখানা আমায় শুধু ধার দেবে? শুধু এটা? কেন দেব না নিশ্চয় দেব। সে সবেগে তার বান্ধবীর গলা জড়িয়ে ধরে, পরম আবেগে তাকে বুকে চেপে ধরে। তারপর তার সম্পদ নিয়ে সে চলে আসে। 'বল' নাচের দিন এসে গেল। মাদাম লোইসেলের জয়জয়কার। সে ছিল সবচেয়ে সুন্দরী, সুরুচিময়ী, সুদর্শনা হাস্যময়ী ও আনন্দপূর্ণ। সব পুরুষ তাকে লক্ষ করছিল, তার নাম জিজ্ঞাসা করে তার সঙ্গে আলাপের আগ্রহ প্রকাশ করছিল। মন্ত্রিসভার সব সদস্যের তার সঙ্গে 'ওয়ালটজ' নৃত্য করতে ইচ্ছা হচ্ছিল। স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী তার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছিলেন। আনন্দে মত্ত হয়ে আবেগ ও উৎসাহ নিয়ে সে নৃত্য করছিল। তার রূপের বিজয়গর্বে, সাফল্যের গৌরবে সে আর কিছুই ভাবে না। এক আনন্দের মেঘের ওপর দিয়ে যেন ভেসে আসছিল! এই

সব আহুতি ও মুগ্ধতা আর জাগ্রত সব কামনা। যে কোনো মেয়ের অন্তরে এই পরিপূর্ণ বিজয় কত মধুর! ভোর চারটার দিকে সে বাড়ি ফিরে গেল। অন্য সেই তিনজন ভদ্রলোকের স্ত্রী খুব বেশি ফুর্তিতে মত্ত ছিল, তাদের সঙ্গে তার স্বামী ছোট বিশ্রামকক্ষে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আধঘুমে বসেছিল। বাড়ি ফিরবার পথে গায়ে জড়াবার জন্য তারা যে আটপৌরে সাধারণ চাদর নিয়ে এসেছিল সে তার কাঁধের ওপর সেটি ছড়িয়ে দেয়। 'বল' নাচের পোশাক অপরূপ সৌন্দর্যের সঙ্গে ঐটির দারিদ্র্য সপুরিস্ফুট হয়ে উঠছিল। মেয়েটি তা অনুভব করতে পারে তাই অন্য যেসব ধনী মেয়ে দামি পশমি চাদর দিয়ে গা ঢেকেছিল তাদের চোখে না পড়বার জন্য সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে লাগল। লোইসেল তাতে টেনে ধরে বলল : থামো, তোমার ঠান্ডা লেগে যাবে ওখানে। আমি একখানা গাড়ি ডেকে আনি। কিন্তু মেয়েটি কোনো কথায় কান না দিয়ে তাড়াতাড়ি সিড়ি বেয়ে নামতে থাকে। রাস্তায় যখন তারা পৌঁছে গেল, সেখানে কোনো গাড়ি পাওয়া গেল না। তারা গাড়ির খোঁজ করতে করতে দূরে কোনো একখানাকে দেখে তার গাড়োয়ানকে ডাকতে থাকে। হতাশ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে তারা সিন নদীর দিকে হাঁটতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে পুরাতন একখানা তারা পায়, তাহলো সেই নিশাচর দুই-যাত্রীর গাড়ি যা প্যারিতে সন্ধ্যার পর লোকের চোখে পড়ে, তার একখানা, যেইদিনে এইগুলি নিজের দুর্দশা দেখাতে লজ্জা পায়। ঐ খানি তাদের মার্টার স্ট্রিটে ঘরের দরজা পর্যন্ত নিয়ে গেল। তারা ক্লান্তভাবে তাদের কক্ষে গেল। মেয়েটির সব কাজ শেষ। কিন্তু স্বামীর ব্যাপারে, তার মনে পড়ল যে দশটায় তাকে আপিসে গিয়ে পৌছাতে হবে। নিজেকে গৌরবময় রূপে শেষ একবার দেখার জন্য সে আয়নার সামনে গিয়ে তার গলায় চাদরখানা খোলে। হঠাৎ সে আর্তনাদ করে উঠল। তার হারখানা গলায় জড়ানো নেই। তার স্বামীর পোশাক তখন মাত্র অর্ধেক খোলা হয়েছে। সে জিজ্ঞাসা

করল কী হয়েছে? উত্তেজিতভাবে মেয়েটি তার দিকে ফিরে বলল : আমার-আমার কাছে-মাদাম ফোরস্টিয়ারের হারখানা নেই। আতঙ্কিতভাবে সে উঠে দাঁড়াল : কী বললে। তা কী করে হবে? এটা সম্ভব নয়। পোশাকের ও বর্হিবাসের ভাঁজের মধ্যে, পকেটে, সব জায়গায় তারা খোঁজ করে। কিন্তু তা পাওয়া গেল না। স্বামী জিজ্ঞাসা করল : ঐ বাড়ি থেকে চলে আসার সময় যে তোমার গলায় ছিল, তোমার ঠিক মনে আছে?

.

হ্যাঁ, আমরা যখন বিশ্রামকক্ষ দিয়ে বেরিয়ে আসছিলাম, তখনও তা ছিল আমার খেয়াল আছে। কিন্তু তুমি যদি ওটা রাস্তায় হারাতে, ওটা পড়বার শব্দ আমাদের কানে শোনা উচিত ছিল। গাড়ির মধ্যেই নিশ্চয়ই পড়েছে মনে হয়। হ্যাঁ, সম্ভবত তাই। তুমি গাড়ির নম্বরটি টুকে নিয়েছিল? না। আর তুমি কি তা লক্ষ করেছিলে।? না। হতাশভাবে তারা একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত লোইসেল আবার পোশাক পরেনি। সে বলল : আমি যাচ্ছি। দেখি যতটা রাস্তা আমরা হেঁটেছিলাম, সেখানে খুজে পাওয়া যায় কিনা। তারপর সে গেল মেয়েটি তার সান্ধ্য গাউন পরেই সে রয়ে গেল। বিছানায় শুতে যাবার শক্তি তার নেই। কোনো উষ্চাশা বা ভাবনা ছাড়াই সে একখানা চেয়ারে গা এলিয়ে পড়ে রইল।

.

মূলরচনা-৪

.

সকাল সাতটার দিকে তার স্বামী ফিরে এলো। কিছুই সে খুঁজে পায়নি। সে পুলিশের কাছে ও গাড়ির আপিসে গিয়েছিল এবং পুরস্কার ঘোষণা করে একটা বিজ্ঞাপনও দিয়ে এসেছে। সে যথাসাধ্য করে এসেছে বলে তাদের মনে কিছুটা আশা হলো। ঐ ভয়ানক বিপর্যয়ে মেয়েটি সারাদিন এক বিভ্রান্ত অবস্থায় কাটাল। সন্ধ্যাবেলা যখন লোইসেল ফিরে এলো তখন তার মুখে যন্ত্রণর মলিন ছাপ, কিছুই সে খুঁজে পায়নি। সে বলল, তোমার বান্ধবীকে লিখে দিতে হবে যে হারখানার আংটা তুমি ভেঙে ফেলেছ, তাই তা তুমি মেরামত করতে দিয়েছ।। তাতে আমরা ভেবে দেখবার সময় পাব। তার নিদের্শমত মেয়েটি তাই লিখে দিল। এক সপ্তাহ শেষ হওয়ায় তারা সব আশা ত্যাগ করল। বয়সে পাঁচ বছরের বড় লোইসেল ঘোষণা করল : ঐ জড়োয়া গহনা ফেরত দেবার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। পরদিন যেই বাক্সে ওটা ছিল, তার ভিতরে যেই স্বর্ণকারের নাম ছিল, তার কাছে তারা সেটা নিয়ে গেল। সে তার খাতাপত্র ঘেঁটে বলল : মাদাম, ঐ হারখানা আমি বিক্রি করিনি, আমি শুধু বাক্সটা দিয়েছিলাম| তারপর তারা সেই হারটির মত হার খোঁজ করার জন্য, তাদের স্মৃতির উপর নির্ভর করে এক স্বর্ণকার থেকে অন্য স্বর্ণকারের কাছে যেতে থাকে। দুজনেরই শরীর বিরক্তি ও উদ্বেগে খারাপ হয়ে গেছে। প্যালেস রয়েলে তারা এমন এক হীরার কন্ঠহার দেখল সেটা ঠিক তাদের হারানো হারের মতো। তার দাম চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ। ছত্রিশ হাজার ফ্রাঁতে তারা তা পেতে পারে। তিন দিন যেন ওটা বিক্রি না করে সে জন্য তারা স্বর্ণকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করল। তারা আরও ব্যবস্থা করল যে, যদি ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হওয়ার আগে ঐ হারটি খুঁজে পাওয়া যায়, তারা এটা ফেরত দিলে চৌত্রিশ হাজার ফ্রাঁ ফেরত নিতে পারবে। লোসেলের কাছে তার বাবার মৃত্যুর পরে প্রাপ্ত আঠারো হাজার ফ্রাঁ ছিল। বাকিটা সে ধার করল। মাদার লোইসেল যখন জড়ো গহনা মাদাম ফোরস্টিয়ারকে ফেরত দিতে গেল তখন শেষোক্ত মেয়েটি নির্জীবকণ্ঠে বলল : ওটা

আরও আগে তোমায় ফেরত দেওয়া উচিত ছিল; কারণ তা আমারও দরকার হতে পারত। তার বান্ধবী সেই ভয় করেছিল, তেমনভাবে সে গহনার বাক্সটি খুলল না। যদি বদলে দেওয়া হয়েছে। টের পেত, সে কী মনে করত? সে কী বলত? সে কী তাকে অপহারক ভাবত? এবার মাদার লোইসেল দারিদ্রের জীবনের ভয়াবহতা বুঝতে পারে। সে তার নিজের কাজ সম্পূর্ণ সাহসের সঙ্গেই করে যায়। ঐ দুঃখজনক দেনা শোধ করা প্রয়োজন। সে তা দেবে। দাসীকে তারা বিদায় করে দিল। তারা তাদের বাসা পরিবর্তন করল। নিচু ছাদের কয়েকটি কামরা তারা ভাড়া করল। ঘরকন্যার কঠিন সব কাজ ও রান্নাঘরের বিরক্তিকর কাজকর্ম সে শিখে নিল। তার গোলাপি নখ দিয়ে সে বাসন ধোয়, তৈলাক্ত পাত্র ও ঝোল রাঁধার কড়াই মাজে। ময়লা কাপড় চোপড়, শেমিজ, বাসন মোছার গামছা সে পরিষ্কার করে দড়িতে শুকাতে দেয়। রোজ সকালে সে আবর্জনা নিয়ে রাস্তায় ফেলে। সিঁড়ির প্রত্যেক ধাপে শ্বাস নেবার জন্য থেমে থেমে সে জল তোলে।

.

মূলরচনা-৫

সাধারণ পরিবারের মেয়ের মতো পোশাক পরে সে হাতে ঝুড়ি নিয়ে মুদি, কসাই ও ফলের দোকানে যায় এবং তার দুঃখের পয়সার একটির জন্য পর্যন্ত দর কষাকষি করে। প্রত্যেক মাসেই সময় চেয়ে কিছু দলিল বদল করতে হয়, কাউকে কিছু শোধ দিতে হয়। তার স্বামীও সন্ধ্যাবেলা কাজ করে। সে কয়েজকন ব্যবসায়ীর হিসাবের খাতা ঠিক করে। রাত্রে এক পাতা পাঁচ 'সাও' হিসেবে সে প্রায় লেখা নকল করে। এরকম জীবন দশ বছর ধরে চলল। দশ বছরের শেষে তারা সব কিছু মহাজনের

সুদসহ প্রাপ্য নিয়ে সব ক্ষতিপূরণ করে ফেলতে পারে। তাছাড়া কিছু তাদের সঞ্চয়ও হলো। মাদার লোইসেলকে দেখলে এখন বয়স্কা বলে মনে হয়। সে এখন গরিব গৃহস্তঘরের শক্ত, কর্মঠ ও অমার্জিত মেয়ের মতো হয়ে গেছে। তার চুল অবিন্যস্ত ঘাঘরা একপাশে মোচড়ানো, হাতগুলো লাল। সে চড়াগলায় কথা বলে এবং বড় বড় কলসিতে জল এনে মেঝে ধোয়। কিন্তু কখনও, তার স্বামী যখন আপিসে থাকে, জানালার ধারে বসে বিগত দিনের সেই সান্ধ্য অনুষ্ঠান ও সেই 'বল' নাচে তাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল ও এমন অতিরিক্ত প্রশংসা পেয়েছিল, তার কথা সে ভাবে। যদি সে গলার সেই হারখানা না হারাত তাহলে কেমন হতো? কে জানে কে বলতে পারে? কী অনন্যসাধারণ এই জীবন আর তার মধ্যে কত বৈচিত্র্য! সামান্য একটি বস্তুতে কী করে একজন ধ্বংস হয়ে যেতে আবার বাঁচতেও পারে! এক রবিবারে সারা সপ্তাহের নানা দুশ্চিন্তা মন থেকে দূর করার জন্য সে যখন চামপস-এলসিস-এ ঘুরে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ একটি শিশু নিয়ে ভ্রমণরতা একজন মেয়ে তার চোখ পড়ল। সে হলো মাদাম ফোরস্টিয়ার। সে এখনও যুবতী, সুন্দরী ও আকর্ষণীয়া। দেখে মাদাম লোইসেলের মন খারাপ হয়ে গেল। সে কি ঐ মেয়েটির সঙ্গে কথা বলবে? হ্যাঁ অবশ্যই বলবে। তাকে যখন সব শোধ করা হয়েছে তখন সব কিছু খুলে সে বলবে। কেন বলবে না? সে মেয়েটির কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, সুপ্রভাত জেনি, তার বন্ধু তাকে চিনতে পারল না। এক সাধারণ মানুষ তাকে এমন অন্তরঙ্গভাবে সম্বোধন করায় সে অবাক হলো। সে বিব্রতভাবে বলল। কিন্তু মাদাম-আপনাকে চিনতে পারলাম না। বোধহয় আপনার ভুল হয়েছে-না, আমি মাতিলদা লোইসেল। তার বান্ধবী বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠে বলল : হায়, আমার বেচারী মাতিলদা। এমনভাবে কী করে তুমি বদলে গেলে। হ্যাঁ তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর তেকে আমার দুর্দিন যাচ্ছে-বেশ কিছু দুঃখের দিন গেছে আর সেটা হয়েছে শুধু তোমার জন্য। আমার জন্য? তা কী করে হলো? সেই যে কমিশনারের বল

নাচের দিন তুমি আমাকে তোমার হীরার হার পরতে গিয়েছিলে, মনে পড়ে? হ্যাঁ, বেশ মনে আছে। কথা হচ্ছে, সেখানা আমি হরিয়ে ফেলেছিলাম। কী বলছ তুমি? কী করে তা আমায় তুমি ফেরত দিয়েছিলে? ঠিক সেখানার মতো একটি তোমাকে আমি ফেরত দিয়েছিলাম। তার দাম দিতে দশ বছর লেগেছে। তুমি বুঝতেই পার। আমদের মতো লোক যাদের কিছুই ছিল না, তাদের পক্ষে তা সহজ ছিল না। কিন্তু তা শেষ হয়েছে এবং সেজন্য আমি এখন ভালোভাবে নিশ্চিন্ত হয়েছি। মাদাম ফোরস্টিয়ার তাকে কথার মাঝপথে থামিয়ে বলল: তুমি বলছ যে, আমারটা ফিরিয়ে দেবার জন্য তুমি একখানা হীরার হার কিনেছিলে? হ্যাঁ, তা তুমি খেয়াল করনি? ঐ দুটি এক রকম ছিল বলে সে গর্বের ভাবে ও সরল আনন্দে হাসল। দেখে মাদার ফোরস্টিয়ার-এর মনে খুব লাগল। সে তার দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল : হায়, আমার বেচারী মাতিলদা। আমারটি ছিল নকল। তার দাম পাঁচশত ফ্রাঁর বেশি হবে না।

-

শব্দার্থ ও টীকা

=============

[illegible] কনভেন্ট - খ্রিস্টান নারী মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত স্কুল। মিশনারিদের আবাস।

[illegible] মাসিঁয়ে – সৌজন্য প্রদর্শন ও সম্মান জানানোর জন্য ফ্রান্সে পুরুষদের মাসিঁয়ে সম্বোধন করা হয়।

[illegible] মাদাম – সৌজন্য প্রদর্শন ও সম্মান জানানোর জন্য ফ্রান্সে মহিলাদের মাদাম সম্বোধন করা হয়।

[illegible] ফ্রাঁ -ফরাসি মুদ্রার নাম। ২০০২ সাল পর্যন্ত এই মুদ্রা প্রচলিত ছিল। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হওয়ায় ফ্রান্স ইউরো ব্যবহার করে।

[illegible] 'বল' নাচ-বিনোদনমূলক সামাজিক নৃত্যানুষ্ঠান। ইউরোপ-আমেরিকাসহ পৃথিবীর বহু দেশে এই নৃত্য প্রচলিত।

[illegible] ক্রুশ - খ্রিস্টন ধর্মীয় প্রতীক।

[illegible] স্যাটিন- Satin মসৃণ ও চকচকে রেশমি বস্ত্র।

[illegible] প্যারী -প্যারিসের ফরাসি নাম।

[illegible] প্যালেস রয়েল - রাজকীয় প্রাসাদ।

পাঠ-পরিচিতি

============

বিশ্ববিখ্যাত গল্পকার গী দ্য মোপাসাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলোর মধ্যে 'নেকলেস' অন্যতম। ফরাসি ভাষায় গল্পটির নাম 'La Parure'। ১৮৮৪ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি ফরাসি পত্রিকা 'La Gaulois'-এর গল্পটি প্রকাশিত হয় এবং সে বছরই ইংরেজিতে অনূদিত হয়। একই সালে প্রকাশিত 'নেকলেস' শীর্ষক গল্পগ্রন্থের মধ্যে গল্পটি স্থান পায়। অপ্রত্যাশিত কিন্তু অত্যন্ত আকর্ষণীয় সমাপ্তির জন্য গল্পটি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে।

কবি পরিচিতি

রক্তে আমার অনাদি অস্থি

দিলওয়ার

কবি পরিচিতি

দিলওয়ার ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের পহেলা জানুয়ারি সিলেট শহরসংলগ্ন সুরমা নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী ভার্থখলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম দিলওয়ার খান। কবি-জীবনের শুরু থেকেই তিনি জনমনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে পারিবারিক 'খান' পদবি বর্জন করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী মোহাম্মদ হাসান খান, জননী রহিমুন্নেসা। দিলওয়ার সাধারণ্যে 'গণমানুষের কবি' হিসেবে সমধিক পরিচিত। পেশা জীবনে প্রথমে দুমাস শিক্ষকতা করলেও ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে 'দৈনিক সাংবাদ' পত্রিকায় এবং ১৯৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দে দৈনিক গণকণ্ঠে' সহকারী সম্পাদক হিসেবে তিনি কাজ করেন। কিন্তু স্বাস্থ্যগত কারণে ওই পেশা তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়। তিনি ছিলেন মূলত সার্বক্ষণিক কবি, লেখক ও ছড়াকার। তাঁর কবিতার মূলসুর দেশ, মাটি ও মানুষের প্রতি আস্থা ও দায়বদ্ধতা। গণমানবের মুক্তি তাঁর লক্ষ্য; বিভেদমুক্ত কল্যাণী পৃথিবীর তিনি স্বাপ্নিক। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর প্রকাশিত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ 'ঐকতান', 'উদ্ভিন্ন উল্লাস', 'স্বনিষ্ঠ সনেট', 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি', 'সপৃথিবী রইবে সজীব', 'দুই মেরু দুই ডানা', 'অনতীত পঙ্ক্তিমালা' তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ : 'বাংলাদেশ জন্ম না নিলে'। ছড়াগ্রন্থ: দিলওয়ারের শতছড়া', 'ছড়ায় অ আ ক খ'। সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি লাভ করেছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও 'একুশে পদক'।

কবি দিলওয়ার ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ১০ই অক্টোচর মৃত্যুবরণ করেন।

মূলকবিতা

============

পদ্মা তোমার যৌবন চাই

যমুনা তোমার প্রেম

সুরমা তোমার কাজল বুকের

পলিতে গলিত হেম।

পদ্মা যমুনা সুরমা মেঘনা

গঙ্গা কর্ণফুলী,

তোমাদের বুকে আমি নিরবধি

গণমানবের তুলি!

কত বিচিত্র জীবনের রং

চারদিকে করে খেলা,

মুগ্ধ মরণ বাঁকে বাঁকে ঘুরে

কাটায় মারণ বেলা!

রেখেছি আমার প্রাণ স্বপ্নকে

বঙ্গোপসাগরেই,

ভয়াল ঘূর্ণি সে আমার ক্রোধ

উপমা যে তার নাই!

এই ক্রোধ জ্বলে আমার স্বজন

গণমানবের বুকে-

[illegible] নরদানব-নরপশু। মানুষরূপী দানব। এখানে বিদেশি নরপিচাশদের বোঝানো হয়েছে।

[illegible] অশেষ নদী ও ঢেউ-আবহমান ছুটে চলা নদী ও ঢেউ।

[illegible] রক্তে আমার অনাদি অস্থি-জাতিসত্তার শোণিত এবং অস্থি যে কবি নিজের অস্তিত্বে ধারণ কওে আছেন, এখানে সে-কথাই আলংকারিক ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে।

পাঠ-পরিচিতি

'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি কবির একই নামের কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা। 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে সিলেট থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। সংকলিত কবিতাটি কবির চৌধুরীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত। 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় দিলওয়ার সাগরদুহিতা ও নদীমাতৃক বাংলাদেশের বন্দনা করেছেন এবং গণমানবের শিল্পী হিসেবে নিজের প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন। কবি বলেছেন, এই বাংলায় জীবনরূপ যেসব নিরন্তর বয়ে চলেছে, গণশিল্পীর তুলি হাতে সেই বিচিত্র জীবনেরই তিনি রূপকার। তবে বহমান জীবন এখানে বাধাহীন নয়। প্রবহমান নদীর বাঁকে বাঁকে পাতা রয়েছে মৃত্যুর ফাঁদ। কিন্তু কবি একথা জানতে ভোলেন না যে, তিনি তাঁর স্বপ্নকে বিশাল বঙ্গোপসাগরের শক্তির কাছে আমানত রেখেছেন। এই শক্তিই সাগরের ঘূর্ণ্যমান ভয়াল জলরাশির মতো তাঁর ক্রোধকে শক্তিমান করেছে। আর এই ক্রোধ কেবল কবির একার নয়, সমগ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদে পরিণত হয়েছে। এ কারণে বিদেশি নরদানবের আগ্রাসন এ জনগোষ্ঠীকে দমাতে পারে না। বিদেশিরা হয়ত জানে

না যে, আবহমান ছুটে চলা নদীর মতোই কবি নিজের অস্তিত্বে ধারণ করে আছেন ওই জাতি সত্তার শোনিত ও অস্থি।

কবিতাটি ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রতি পঙ্‌ক্তি ৬+৬ মাত্রার পূর্ণপর্বে এবং ২ মাত্রার অপূর্ণ পর্বে বিন্যস্ত।

লোক-লোকান্তর

আল মাহমুদ

কবি পরিচিতি

আল মাহমুদ ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ই জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মৌড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মির আবদুস শুকুর আল মাহমুদ। তাঁর পিতার নাম আবদুর রব মির ও মাতার নাম রওশন আরা মির। তিনি বাহ্মণবাড়িয়ায় মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। দীর্ঘদিন তিনি সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ‘দৈনিক গণকন্ঠ’ ও দৈনিক কর্ণফুলী’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। পরে তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে যোগদান করেন এবং পরিচালকের পদ থেকে অবসরে যান।

আধুনিক বাংলা কবিতায় আল মাহমুদ অনন্য এক জগৎ তৈরি করেন। সেই জগৎ যন্ত্রণাদগ্ধ শহরজীবন নিয়ে নয়-স্নিগ্ধ-শ্যামল, প্রশান্ত গ্রামজীবন নিয়ে। গ্রামীণ জীবন ও

প্রকৃতির চিরায়ত রূপ নিজিস্ব কাব্যভাষা ও সংগঠনে শিল্পিত করে তোলেন কবি আল মাহমুদ। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে-কাব্যগ্রন্থ: 'লোক-লোকান্তর', 'কালের কলস', 'সোনালি কাবিন', 'মায়াবি পর্দা দুলে উঠো', 'অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না', 'বখতিয়ারের ঘোড়া', 'আরব্য রজনীর রাজহাঁস'; শিশুতোষ কাব্যগ্রন্থ: 'পাখির কাছে ফুলের কাছে'; উপন্যাস : 'ডাহুকী', 'কবি ও কোলাহল', 'নিশিন্দা নারী', 'আগুনের মেয়ে' ইত্যাদি। ছোটগল্প : 'পানকৌড়ির রক্ত', 'সৌরভের কাছে পরাজিত', 'গন্ধবণিক'।

তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন।

মূলকবিতা

আমার চেতনা যেন একটি শাদা সত্যিকার পাখি,

বসে আছে সবুজ অরণ্যে এক চন্দনের ডালে;

মাথার ওপরে নিচে বনচারী বাতাসের তালে

দোলে বন্য পানলতা, সুগন্ধ পরাগে মাখামাখি

হয়ে আছে ঠোঁট তার। আর দুটি চোখের কোটরে

কাটা সুপারির রং, পা সবুজ, নখ তীব্র লাল

যেন তার তন্ত্রে মন্ত্রে ভরে আছে চন্দনের ডাল

চোখ যে রাখতে নারি এত বন্য ঝোপের ওপরে।

তাকাতে পারি না আমি রূপে তার যেন এত ভয়

যখনি উজ্জ্বল হয় আমার এ চেতনার মণি,

মনে হয় কেটে যাবে, ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি

সংসার সমাজ ধর্ম তুচ্ছ হয়ে যাবে লোকালয়।

লোক থেকে লোকান্তরে আমি যেন স্তব্ধ হয়ে শুনি

আহত কবির গান। কবিতার আসন্ন বিজয়।

শব্দার্থ ও টীকা

[illegible] আমরা চেতনা চন্দনের ডালে-কবি তাঁর কাব্যবোধ ও কাব্যচেতনাকে সাদা এক সত্যিকার পাখির প্রতিমায় উপস্থাপন করেছেন। কবির এই চেতনা-পাখি বসে আছে সবুজ অরণ্যের কোনো এক চন্দনের ডালে। এই চন্দন সগন্ধি কাঠের গাছ। আর এর ফুল ঝাল-মিষ্টি লবঙ্গ। কবির কাব্যসত্তার মধুরতার সঙ্গে চন্দনের সম্পর্ক নিহিত।

[illegible] মাথার ওপরে নিচে... হয়ে আছে ঠোঁট তার-চন্দনের ডালে বসে থাকা কবির চেতনা-পাখির ওপরে-নিচে বনচারী বাতাসের সঙ্গে দোল খায় পানলতা। প্রকৃতির এই রহস্যময়-সৌন্দর্যের মধ্যে সুগন্ধি পরাগে মাখামাখি হয়ে ওঠে কবির ঠোঁট, অস্তিত্বের স্বরূপ, কাব্যভাষা।

[illegible] আরো দুটি চোখের কোটরে ... ঝোপের ওপরে -কবির অস্তিত্ব জুড়ে চিরায়ত গ্রামবাংলা-দৃষ্টিতে কাটা সুপারির রং। এ যেন চিরায়ত বাংলার রূপ। যতদূর চোখ যায়, কেবল চোখে পড়ে বাংলার অফুরন্ত রং। তার পা সবুজ, নখ তীব্র লাল-এ যেন মাটি আর আকাশে মেলে ধরা কবির নিসর্গ-উপলব্ধির অনিন্দ্যপ্রকাশ। আর সেই সমবেত সৌন্দর্যের তন্ত্রে-মন্ত্রে, রহস্যময়তায় ভরে উঠেছে কবির দৃষ্টি ।

[illegible] তাকাতে পারি না আমি...কবিতার আসন্ন বিজয়-সৃষ্টির প্রেরণায় কবি চিরকালই উদ্বুদ্ধ হন, উজ্জ্বল হয় তাঁর চেতনার মণি। পৃথিবীর কোনো বিধিবিধান, কোনো নিয়মকানুন, কোনো ধর্ম, কোনো সমাজ-সংস্কার বা লোকালয়ের অধীন তিনি আর তখন থাকেন না। তখন সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়। একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে চেতনার জগৎ, শব্দসৌধ। তাঁর সেই সৃষ্টির কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বিচিত্র টানাপোড়েন ও জীবন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে তাকে উত্তীর্ণ হতে হয় কবিতার সার্বভৌমত্বে এবং জয় হয় কবিতার ।

পাঠ-পরিচিতি

এ কবিতাটি আল মাহমুদের ‘লোক-লোকান্তর ‘ কাব্যের নাম-কবিতা। এটি কবির আত্মপরিচয়মূলক কবিতা। কবির চেতনা যেন সত্যিকারের সপ্রাণ এক অস্তিত্ব-পাখিতুল্য সেই কবিসত্তা সুন্দরের ও রহস্যময়তার স্বপ্নসৌধে বিরাজমান। প্রাণের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টির মধ্যে তার বসবাস। কবি চিত্রকল্পের মালা গেঁথে তাঁর কাব্য চেতনাকে মূর্ত করে তুলতে চান। এ কবিতায় এক সুগভীর বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণা কবিকে কাতর করে, আহত করে। তবু কবি সৃষ্টির আনন্দকে উপভোগ করতে আগ্রহী। তাঁর সৃষ্টির বিজয় অবশ্যম্ভাবী-এই প্রত্যয় তাঁর বিচ্ছিন্নতাবোধের বেদনাকে প্রশমিত করে।

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়

সৈয়দ শামসুল হক

কবি পরিচিতি

সৈয়দ শামসুল হক ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭এ ডিসেম্বর কুড়িগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ সিদ্দিক হুসাইন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন। সৈয়দ হক প্রথমে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি বিবিসি বাংলা বিভাগের প্রযোজক ছিলেন। পরে তিনি পুরোপুরি সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। একাধারে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, কাব্যনাট্য ও শিশুসাহিত্যে লেখক হওয়ায় তিনি সব্যসাচী লেখক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। চিত্রনাট্য রচয়িতা ও গীতিকার হিসেবেও তিনি খ্যাত। মানুয়ের জটিল জীবনপ্রবাহ এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল প্রবণতা। সাহিত্যের গঠনশৈলীর ক্ষেত্রে তিনি সর্বদাই নিরীক্ষাপ্রিয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হলো: ‘বৈশাখে রচিত পঙক্তিমালা’ , ‘প্রতিধ্বনিগণ’ , ‘পরাণের গহীন ভিতর’ . ‘রজ্জুপথে চলেছি’ । ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’ , ‘গণনায়ক’ , ‘নূরলদীনের সারাজীবন’ , ‘এখানে এখন’ , ‘ঈষা’ প্রভৃতির তাঁর কাব্যনাটক। সৈয়দ শামসুল হক বাংলা একাডেমি পুরস্কার, আদমজি সাহিত্য পুরস্কার, নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং একুেশে পদকসহ বিভিন্ন সম্মাননায় ভূষিত হন।

মূলকবিতা

নিলক্ষা আকাশ নীল, হাজার হাজার তারা ঐ নীলে অগণিত আর

নিচে গ্রাম, গঞ্জ, হাট, জনপদ, লোকালয় আছে উনসত্তর হাজার।

ধবল দুধের মতো জ্যোৎস্না তার ঢালিতেছে চাঁদ-পূর্ণিমার।

নষ্ট ক্ষেত, নষ্ট মাঠ, নদী নষ্ট, বীজ নষ্ট, বড় নষ্ট যখন সংসার

তখন হঠাৎ কেন দেখা দেয় নিলক্ষার নীলে তীব্র শিস

দিয়ে এত বড় চাঁদ?

অতি অকস্মাৎ

স্তব্ধতার দেহ ছিঁড়ে কোন ধ্বনি? কোন শব্দ? কিসের প্রপাত?

গোল হয়ে আসুন সকলে,

ঘন হয়ে আসুন সকলে,

আমার মিনতি আজ স্থির হয়ে বসুন সকলে।

অতীত হঠাৎ হাতে হানা দেয় মানুষের বন্ধ দরোজায়।

এই তীব্র স্বচ্ছ পূর্ণিমায়

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়।

কালঘুম যখন বাংলায়

তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে আবার নূরলদীন দেখা দেয় মরা আঙিনায়।

নূরলদীনের বাড়ি রংপুরে যে ছিল,

রংপুরে নূরলদীন একদিন ডাক দিয়েছিল

১১৮৯ সনে।

আবার বাংলার বুঝি পড়ে যায় মনে,

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়

যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়,

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়

যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালেরই আলখাল্লায়;

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়

যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায়'

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়

যখন আমার কন্ঠ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়'

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়

যখন আমারই দেশে এ আমার দেহ থেকে রক্ত ঝরে যায়

ইতিহাসে, প্রতিটি পৃষ্ঠায়।

আসুন, আসুন তবে, আজ এই প্রশস্ত প্রান্তরে;

যখন স্মৃতির দুধ জ্যোৎস্নার সাথে ঝরে পড়ে,

তখন কে থাকে ঘুমে? কে থাকে ভেতরে?

কে একা নিঃসঙ্গ বসে অশ্রুপাত করে?

সমস্ত নদীর অশ্রু অবশেষে ব্রহ্মপুত্রে মেশে।

নূরলদীনেরও কথা যেন সারা দেশে

পাহাড়ি ঢলের মতো নেমে এসে সমস্ত ভাষায়,

অভাগা মানুষ যেন জেগে ওঠে আবার এ আশায়

যে, আবার নূরলদীন একদিন আসিবে বাংলায় ,

আবার নূরলদীন একদিন কাল পূর্ণিমায়

দিবে ডাক, 'জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?'

শব্দার্থ ও টীকা

[illegible] নিলক্ষা-দৃষ্টিসীমা অতিক্রমী।

[illegible] ধবল দুধের মতো জ্যোৎস্না-সাদা দুধের মতো জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার রঙকে দধের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

[illegible] স্তব্ধতার দেহ-এখানে নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশ বোঝানো হয়েছে।

[illegible] প্রপাত-নির্ঝরের পতনের স্থান। জলপ্রপাত।

[illegible] হানা দেয়-আক্রমণ করে। আবির্ভূত হয় অর্থে ব্যবহৃত।

[illegible] কালঘুম-মৃত্যু; চিরনিদ্রা।

[illegible] মরা আঙিনায়-মৃত্যু নিথর অঙ্গনে।

[illegible] বাহে-বাপুহে। দিনাজপুর, রংপুর এলাকার সম্বোধন বিশেষ।

[illegible] কোনঠে- কোথায় ।

পাঠ-পরিচিতি

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটি সৈয়দ শামসুল হকের বিখ্যাত কাব্যনাটক 'নূরলদীনের সারাজীবন' শীর্ষক কাব্যনাটক থেকে সংকলিত হয়েছে। এটি এই নাটকের প্রস্তাবনা অংশ।

নাটকটির প্রস্তাবনা অংশে সূত্রধার আবেগঘন কাব্যিক বর্ণনার মাধ্যমে দর্শকদের সঙ্গে নাট্যকাহিনির সংযোগ স্থাপন করেছেন। নূরলদীন এক ঐতিহাসি চরিত্র। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সাহসী কৃষকনেতা নূরলদীনের সংগ্রামের কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সৈয়দ শামসুল হক ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নূরলদীনের সাহস আর ক্ষোভকে অসামান্য নৈপুণ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে।

১৯৭১ সালের ২৫ এ মার্চ কালরাত থেকে শুরু করে দীর্ঘ নয় মাস যখন এই বাংলা মৃত্যুপুরীতে রূপ নেয়, যখন শকুনরূপী দালালের আলখাল্লায় ছেয়ে যায় দেশ, যখন বাঙালি হারায় তার স্বপ্ন ও বাক-স্বাধীনতা, যখন স্বজনের রক্তে ভেসে যায় ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠা-তখন মনে পড়ে ইতিহাসের প্রতিবাদী নায়ক নূরলদীনকে-এই চেতনাই কবিতাটিতে সৈয়দ শামসুল হক তুলে ধরতে চেয়েছেন। ১১৮৯ বঙ্গাব্দে (১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ) নূরলদীনের ডাকে মানুষ যেভাবে জেগে উঠেছিল, এখনও ঠিক সেইভাবে

জেগে উঠবে বাংলার জন-মানুষ-এটাই কবির বিশ্বাস। এভাবে কবির শিল্পভাবনায় নূরলদীন ক্রমান্বয়ে এক চিরায়ত প্রতিবাদের প্রতীকে পরিণত হয়। ইতিহাসের পাতা থেকে বেরিয়ে এসে নূরলদীন মিশে যায় বাংলার শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের ভিড়ে- অংশগ্রহণ করে সমকালীন সকল আন্দোলন-সংগ্রামে। তাই কবির মনে হয়-অভাগা মানুষ জেগে উঠে পাহাড়ি ঢলের মতো ভাসিয়ে দেবে অন্যায় যখন নূরলদীন দেবে ডাক-'জাগো, বাহে, কোনঠে সবাই' ।

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

কবি পরিচিতি

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার অন্তগত বহেরচর-ক্ষুদ্রকাঠি গামে ১৯৩৪ খ্রিস্টব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে বিএ (সম্মান)- সহ এমএ পাস করে কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পরে সিবিল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং সরকারের বিভিন্ন উষ্চপদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকারের কৃষি ও পানিসম্পদ মন্ত্রী এবং ১৯৮৪-তে যুক্ত রাষ্টে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবস্থান বিশেষভাবে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত।

তাঁর কবিতার বিষয়ে বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এবং এই বিষয়ক সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তিনি

একুশে পদকে ভূষিত হন। বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য তাঁকে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রদান করা হয়। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হলো : 'সাত নরীর হার', 'কখনো রং কখনো হার', 'কমলের চোখ', 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি', 'বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা', 'আমার সময়' প্রভৃতি। এছাড়াও ইংরেজি ভাষায়ও তাঁর একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

২০০১ খ্রিস্টাব্দের ১৯এ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মূলকবিতা

================

আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।

তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল

তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল।

তিনি অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন

অরণ্য এবং শ্বাপদের বথা বলতেন

পতিত জমি আবাদের কথা বলতেন

তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।

জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা

কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা।

যে কবিতা শুনতে জানে না

সে ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে।

যে কবিতা শুনতে জানে না

সে দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

যে কবিতা শুনতে জানে না

সে আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে।

আমি উচ্চারিত সত্যের মতো

স্বপ্নের কথা বলছি।

উনোনের আগুনে আলোকিত

একটি উজ্জ্বল জানালার কথা বলছি।

আমি আমার মায়ের কথা বলছি,

তিনি বলতেন প্রবহমান নদী

যে সাঁতার জানে না তাকেও ভাসিয়ে রাখে।

যে কবিতা শুনতে জানে না

যে নদীতে ভাসতে পারে না।

যে কবিতা শুনতে জানে না

সে মাছের সঙ্গে খেলা করতে পারে না।

যে কবিতা শুনতে জানে না

সে মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না।

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।

আমি বিচলিত স্নেহের কথা বলছি

গর্ভবতী বোনের মৃত্যুর কথা বলছি

আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি।

ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়

যুদ্ধ আসে ভালোবেসে

মায়ের ছেলেরা চলে যায়,

আমি আমার ভাইয়ের কথা বলছি।

যে কবিতা শুনতে জানে না

সে সন্তানের জন্য মরতে পারে না।

যে কবিতা শুনতে জানে না

সে ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না।

যে কবিতা শুনতে না

সে সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখতে পারে না।

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।

তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল

কারণ তিনি ক্রীতদাস ছিলেন।

যে কর্ষণ করে

শস্যের সম্ভার তাকে সমৃদ্ধ করবে।

যে মৎস্য লালন করে

প্রবহমান নদী তাকে পুরস্কৃত করবে।

যে গাভীর পরিচর্যা করে

জননীর আশীর্বাদ তাকে দীর্ঘায়ু করবে।

যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে

ইস্পাতের তরবারি তাকে সশস্ত্র করবে।

দীর্ঘদেহ পুত্রগণ

আমি তোমাদের বলছি।

আমি আমার মায়ের কথা বলছি

বোনের মৃত্যুর কথা বলছি

ভাইয়ের যুদ্ধের কথা বলছি।

আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি।

আমি কবি এবং কবিতার কথা বলছি।

সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা

সুপুরুষ ভালোবাসার সুকন্ঠ সংগীত কবিতা

জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা

রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ কবিতা।

আমরা কি তাঁর মতো কবিতার কথা বলতে পারব।

আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারব।

শব্দার্থ ও টীকা

[illegible] কিংবদন্তি-জনশ্রুতি। লোকপরম্পরায় শ্রুত ও কথিত বিষয় যা একটি জাতির ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী।

[illegible] পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত-মানুষের ওপর অত্যাচার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এখানে। সেই অত্যাচারের আঘাত যে এখনও তাজা রয়েছে তা বোঝাতেই রক্তজবার প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। আরও লক্ষণীয়, আঘাত রয়েছে পিঠে। অর্থাৎ শত্রুরা ভীরু

কাপুরুষের মতো পিছন থেকে আক্রমণ করেছে কিংবা বন্দি ক্রীতদাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, মুক্ত মানুষের সঙ্গে সম্মুখ বীরোচিত সাহস দেখায়নি।

[illegible] শ্বাপদ -হিংস মাংসাশী শিকারি জন্তু।

[illegible] উনোনের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালা -আগুনে সবকিছু শুচি হয়ে ওঠে। তাই আগুনের উত্তাপে পরিশুদ্ধ হয়ে সকল গ্লানি মুছে ফেলে আলোয় ভরা মুক্তজীবনের প্রত্যাশা জানাতে উজ্জ্বল জানালার অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে।

[illegible] বিচলিত স্নেহ-আপনজনের উৎকন্ঠা। মুক্তিপ্রত্যাশী মানুষের আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় তাদের স্বজনরা উদ্বিগ্ন হন। ভালোবাসা আর শঙ্কা একসঙ্গে মিশে যায়।

[illegible] সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখা-সূর্য সকল শক্তির উৎস। তাই এই সর্বশক্তির আধারকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারলে মুক্তি অনিবার্য। কবির মতে, এই সামর্থ্য অর্জনের একমাত্র উপায় হলো কবিতা শোনা, কবিতাকে আত্মস্থ করা। কেননা কবির কাছে শুধু কবিতাই সত্য আর সত্যই শক্তি।

পাঠ-পরিচিতি

কবিতাটি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর বিখ্যাত কাব্যগন্থ ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি ’ কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা। রচনাটি বিষয় ও আঙ্গিকগত অভিনবত্ব রয়েছে। আলোচ্য কবিতাটিতে উচ্চারিত হয়েছে ঐতিহ্যসচেতন শিকড়সন্ধানী মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির দৃপ্ত ঘোষণা। প্রকৃতপক্ষে, রচনার প্রেক্ষাপটে আছে বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস, এই জাতির সংগ্রাম বিজয় ও মানবিক উদ্ভাসনের অনিন্দ্য

অনুষঙ্গসমূহ। তিনি এই কবিতায় পৌনঃপুনিকভাবে মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সোচ্চার হন। কবির একান্ত প্রত্যাশিত মুক্তির প্রতীক হয়ে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে চলেন। কবির বর্ণিত এই ইতিহাস মাটির কাছাকাছি মানুষের ইতিহাস; বাংলার ভূমিজীবী অনার্য ক্রীতদাসের লড়াই করে টিকে থাকার ইতিহাস। ‘কবিতা ‘ ও সত্যের অভেদকল্পনার মধ্য দিয়ে কবি নিয়ে আসেন মায়ের কথা, বোনের কথা, ভাইয়ের কথা, পরিবারের কথা। কবি এ-ও জানেন মুক্তির পূর্বশর্ত যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধে পরিবার থেকে দূরে সরে যেতে হয়। ভালোবাসার জন্য, তাদের মুক্ত করবার জন্যই তাদের ছেড়ে যেতে হয়। এই অমোঘ সত্য কবি জেনেছেন আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস থেকে। কবিতাটির রসোপলব্ধির অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো এর আঙ্গিক বিবেচনা। এক্ষেত্রে, প্রথমেই যে বিষয়টি পাঠককে নাড়া দেয় তা হলো একই ধাঁচের বাক্যের বারংবার ব্যবহার। কবি একদিকে ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ পঙক্তিটি বারংবার প্রয়োগ করেছেন, অপরদিকে ‘যে কবিতা শুনতে জানে না/সে...’ কাঠামোর পঙক্তিমালার ধারাবাহিক উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে কবিতা আর মুক্তির আবেগকে তিনি একত্রে শিল্পরূপ প্রদান করেছেন। এখানে কিংবদন্তি শব্দবন্ধটি হয়ে উঠেছে ঐতিহ্যের প্রতীক। কবি এই নান্দনিক কৌশলের সঙ্গে সমন্বিত করেছেন গভীরতাসঞ্চারী চিত্রকল্প। একটি কবিতার শিল্পসার্থক হয়ে ওঠার পূর্বশর্ত হলো হৃদয়স্পর্শী চিত্রকল্পের যথোপযুক্ত ব্যবহার। চিত্রকল্প হলো এমন শব্দছবি যা কবি গড়ে তোলেন এক ইন্দ্রিয়ের কাজ অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে করিয়ে কিংবা একাধিক ইন্দ্রিয়ের সম্মিলিত আশ্রয়ে, আর তা পাঠক-হৃদয়ে সংবেদনা জাগায় ইন্দ্রিয়াতীত বোধের প্রকাশসূত্রে। চিত্রকল্প নির্মাণের আরেকটি শর্ত হলো অভিনবত্ব। এ সকল মৌল শর্ত পূরণ করেই আলোচ্য ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়াতীতের দ্যোতনাই সঞ্চারিত হয়। নিবিড়

পরিশ্রমে কৃষকের ফলানো শস্য একান্তই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটি অনুষঙ্গ। কিন্তু এর সঙ্গে যখন কবিতাকে অভেদ কল্পনা করা হয় তখন কেবল ইন্দ্রিয় দিয়ে একে অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। সার্বিক বিবেচনায় কবিতাটি বিষয় ও আঙ্গিকের সৌকর্যে বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সংযোজন। কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত। প্রচলিত ছন্দের বাইরে গিয়ে এটি প্রাকৃতিক তথা স্বাভাবিক ছন্দ।

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শামসুর রাহমান

কবি পরিচিতি

শামসুর রাহমান ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪এ অক্টোবর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নরসিংদীর পাহাড়তলি গ্রামে। তাঁর পিতার নাম মুখলেসুর রহমান চৌধুরী ও মাতার নাম আমেনা বেগম। তিনি ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার পোগোজ স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্টারমিডিয়েট এং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করেন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ‘দৈনিক মর্নিং এজ’ -এ সাংবাদিকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ‘দৈনিক পাকিস্তান’ (পরে দৈনিক বাংরা) পত্রিকায় যোগদান করেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ‘সাপ্তাহিক সোনার

বাংলা’ পত্রিকায় কবির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। তারপর আজীবন তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে কাব্যসাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। সারা জীবন তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের পক্ষে, ছিলেন সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পক্ষে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতাযুদ্ধ ও পরবর্তী সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন তাঁর কবিতাকে করেছে অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। নগর জীবনে যন্ত্রণা ও একাকিত্ব, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন ইত্যাদি তাঁর কবিতার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

শামসুর রাহমানের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ: ‘প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে’, ‘রৌদ্র করোটিতে’, ‘‘বিধ্বস্ত নীলিমা’, ‘নিরালোকে দিব্যরথ’, ‘নিজ বাসভূমে’, ‘বন্দি শিবির থেকে’, ‘ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা’, ‘উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ’, ‘বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়’ ইত্যাদি। এছাড়া গল্প-উপন্যাস, শিশুসাহিত্য ও অনুবাদ কর্মেও তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তিনি আদমজি পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, স্বাধীনতা পুরস্কারসহ অসংখ্যা পুরস্কার, পদক ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

২০০৬ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মূলকবিতা

==========

আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে

কেমন নিবিড় হয়ে। কখনো মিছিলে কখনো-বা

একা হেঁটে যেতে যেতে মনে হয়-ফুল নয়, ওরা

শহিদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর।

একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রং।

এ-রঙের বিপরীত আছে অন্য রং,

যে-রং লাগে না ভালো চোখে, যে-রং সন্ত্রাস আনে

প্রাত্যহিকতায় আমাদের মনে সকাল-সন্ধ্যায়-

এখন সে রঙে ছেয়ে গেছে পথ-ঘাট, সারা দেশ

ঘাতকের অশুভ আস্তানা।

আমি আর আমার মতোই বহু লোক

রাত্রি- দিন ভূলুণ্ঠিত ঘাতকের আস্তানায়, কেউ মরা, আধমরা কেউ,

কেউ বা ভীষণ জেদি, দারুণ বিপ্লবে ফেটে পড়া।

চতুর্দিকে মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ।

বুঝি তাই উনিশশো উনসত্তরেও

আবার সালাম নামে রাজপথে, শূন্যে তোলে ফ্ল্যাগ,

বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে।

সালামের চোখে আজ আলোচিত ঢাকা,

সালামের মুখে আজ তরুণ শ্যামল পূর্ববাংলা।

দেখলাম রাজপথে, দেখলাম আমরা সবাই জনসাধারণ

দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো

ঝরে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা

আর বরকত বলে গাঢ় উচ্চারণে

এখনো বীরের রক্তে দুঃখিনী মাতার অশ্রুজলে

ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চত্বরে

হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়। সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ,

শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে আর দুঃখের ছায়ায়।

শব্দার্থ ও টীকা

[illegible] আবার ফুটেছে দ্যাখো ... আমাদের চেতনারই রং- প্রতি বছর শহরের পথে পথে কৃষ্ণচূড়া ফুল ফোটে। কবির মনে হয় যেন ভাষা-শহিদের রক্তের বুদ্বুদ্ধ কৃষ্ণচূড়া ফুল হয়ে ফুটেছে তাই একুশের কৃষ্ণচূড়াকে কবি আমাদের চেতনার রঙের সঙ্গে মিলিয়েং নিতে চান। ভাষার জন্য যাঁরা রক্ত দিয়েছেন, জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের ত্যাগ আর মহিমা যেন মূর্ত হয়ে ওঠে থরে থরে ফুটে থাকা লাল কৃষ্ণচূড়ার স্তবকে-স্তবকে।

[illegible] মানবিক বাগান-মানবীয় জগৎ। মনুষ্যত্ব, ন্যায় ও মঙ্গলের জগৎ।

[illegible] কমলবন-কবি মানবিকতা, সুন্দর ও কল্যাণের জগৎ বোঝাতে ‘শমলবন ‘ প্রতীকটি ব্যবহার করেছেন।

[illegible] বুঝি তাই উনিশশো ... থাবার সম্মুখে-১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের ক্রমধারায় ছাত্র-অসন্তোষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলন উনিশশো উনসত্তরে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। শহর ও গ্রামের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ছয় দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই আন্দোলন ছিল অপ্রতিরোধ্য। এই আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন আসাদুজ্জামান, মতিউর, ড. শামসুজ্জোহা প্রমুখ। এ অংশে কবি শোষণ আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও আত্মহুতি দেওয়া বীর জনতাকে ভাষা-শহিদ সালাম ও বরকতের প্রতীকে তাৎপর্যময় করে তুলেছেন।

পাঠ-পরিচিতি

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' শীর্ষক কবিতাটি কবি শামসুর রাহমানের 'নিজ বাসভূমে' কাব্যগ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' সংগ্রামী চেতনার কবিতা, দেশপ্রেমের কবিতা, গণজাগরণের কবিতা। ১৯৬৯ এ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে যে গণআন্দোলনের সূচনা ঘটেছিল, কবিতাটি সেই গণজাগরণের পটভূমিতে রচিত। জাতিগত শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এদেশের সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে '৬৯-এ। প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জ থেকে, হাটবাজার থেকে, কলকারখানা থেকে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসংখ্য মানুষ জড়ো হয় ঢাকার রাজপথে। শামসুর রাহমান বিচিত্র শ্রেণি-পেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার অসাধারণ এক শিল্পভাষ্য রচনা করেছেন এই কবিতায়। কবিতাটি দেশমাতৃকার প্রতি জনতার বিপুল ভালোবাসার সংবর্ধিত হয়েছে। দেশকে ভালোবেসে মানুষের আত্মদান ও আত্মহুতির প্রেরণাকে কবি গভীর মমতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মূর্ত করে তুলেছেন।

কবিতাটিতে একুশের রক্তঝরা দিনগুলোতে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এদেশের সংগ্রামী মানুষের আত্মহুতির মাহাত্ম্যে প্রগাঢ়তা লাভ করেছে। গদ্যছন্দ ও প্রবহমান ভাষার সুষ্ঠু বিকাশে কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সংযোজন।

আঠারো বছর বয়স

সুকান্ত ভট্টাচার্য

কবি পরিচিতি

সুকান্ত ভট্টাচার্য-এর জন্ম ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট। তাঁর পৈতৃক নিবাস গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়ায়। তাঁর পিতার নাম নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য, মায়ের নাম সুনীতি দেবী। ছোটবেলা থেকেই সুকান্ত ছিলেন অত্যন্ত রাজনীতি-সচেতন। তিনি 'দৈনিক স্বাধীনতা' র কিশোরসভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সুকান্ত তাঁর কাব্যে অন্যায়-অবিচার শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিপ্লব ও মুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কালে তাঁর কবিতা মুক্তিকামী বাঙালির মনে বিশেষ শক্তি ও সাহস জুগিয়েছিল।

'ছাড়পত্র' তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ: 'ঘুম নেই' , 'পূর্বাভাস' । অন্যান্য রচনা: মিঠেকড়া' , 'অভিযান' , 'হরতাল' ইত্যাদি। তিনি ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের পক্ষে 'অকাল' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই মে মাত্র একুশ বছর বয়সে প্রতিভাবান এ কবির অকালমৃত্যু হয়।

মূলকবিতা

===========

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ

স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,

আঠারো বছর বয়সেই অহরহ

বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।

আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়

পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,

এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়-

আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।

এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য

বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে,

প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য

সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।

আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর

তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা,

এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর

এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।

আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার

পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান,

দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার

ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।

আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে

অবিশ্রান্ত; একে একে হয় জড়ো,

এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে

এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।

তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,

এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,

বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী

এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।

এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়

পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে

এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়-

এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে॥

শব্দার্থ ও টীকা

[illegible] আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ- এ বয়স মাবজীবনের এক উত্তরণকালীন পর্যায়। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে মানুষ এ বয়সে। অন্যদের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিতে হয় তাকে। এদিন থেকে তাকে এক কঠিন সময়ের দুঃসহ অবস্থায় পড়তে হয়।

[illegible] স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি-অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে মাথা উচুঁ করে স্বাধীনভাবে চলার ঝুঁকি এ বয়সেই মানুষ নিয়ে থাকে।

[illegible] বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি-নানা দুঃসাহসী স্বপ্ন, কল্পনা ও উদ্যোগ এ বয়সের তরুণদের মনকে ঘিরে ধরে।

[illegible] আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা-যৌবনে পদার্পণ করে এ বয়সে মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী হয়। জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ায় স্বাধীনভাবে। শৈশব-কৈশোরের পরনির্ভরতার দিনগুলোতে যে কান্না ছিল এ বয়সের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য তাকে সচেতনভাবে মুছে ফেলতে উদ্যোগী হয়।

[illegible] এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য-দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য যুগে যুগে এ বয়সের মানুষই এগিয়ে গেছে সবচেয়ে বেশি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়িয়েছে সমস্ত বিপদ মোকাবেলায়। প্রাণ দিয়েছে অজানাকে জানবার জন্য, দেশ ও জনগণের মুক্তি ও কল্যাণের সংগ্রামে। তাই এ বয়স সুন্দর, শুভ ও কল্যাণের জন্য রক্তমূল্য দিতে জানে।

[illegible] সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে-তারুণ্য স্বপ্ন দেখে নতুন জীবনের, নব নব অগ্রগতি সাধনের। তাই সেইসব স্বপ্ন বাস্তবায়নে, নিত্য-নতুন করণীয় সম্পাদনের জন্য নব নব শপথে বলীয়ান হয়ে তরুণ-প্রাণ এগিয়ে যায় দৃঢ় পদক্ষেপে।

[illegible] তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা- চারপাশের অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, পীড়ন, সামাজিক বৈষম্য ও ভেদাভেদ ইত্যাদি দেখে প্রাণবন্ত তরুণেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

[illegible] এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর- অনুভূতির তীব্রতা ও সুগভীর সংবেদনশীলতা এ বয়সেই মানুষের জীবনে বিশেষ তীব্র হয়ে দেখা দেয় এবং মনোজগতে তার প্রতিক্রিয়াও হয় গভীর।

[illegible] এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা, ভালো-মন্দ, ইতিবাচক-নেতিবাচক নানা তত্ত্ব, মতবাদ, ভাবধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে এই বয়সের তরুণেরা।

[illegible] দুর্যোগে হাল ঠিক মতো রাখা ভার-জীবনের এই সন্ধিক্ষণে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক নানা জটিলতাকে অতিক্রম করতে হয়। এই সময় সচেতন ও সচেষ্টভাবে নিজেকে পরিচালনা করতে না পারলে পদস্খলন হতে পারে। জীবনে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।

[illegible] এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে-সচেতন ও সচেষ্ট হয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে জীবন পরিচালনা করতে না পারার অজস্র ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস এ বয়স নেতিবাচক কালো অধ্যায় হয়ে উঠতে পারে।

[illegible] পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে-এ বয়স দেহ ও মনের স্থবিরতা, নিশ্চলতা, জরাজীর্ণতাকে অতিক্রম করে দুর্বার গতিতে। প্রগতি ও অগ্রগতির পথে নিরন্তর ধাবমানতাই এ বয়সের বৈশিষ্ট্য।

[illegible] এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে-আঠারো বছর বয়স বহু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। জড় নিশ্চল প্রথাবদ্ধ জীবনকে পেছনে ফেলে নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন, কল্যাণ ও সেবাব্রত, উদ্দীপনা, সাহসিকতা, চলার দুর্বার গতি- এসবই আঠারো বছর বয়সের বৈশিষ্ট্য। কবি প্রার্থনা করেন, এসব বৈশিষ্ট্য যেন জাতীয় জীবনে চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

পাঠ-পরিচিতি

সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতাটি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর ‘ছাড়পত্র’ কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। এ কবিতায় কবি নিজের অভিজ্ঞতার

আলোকে বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের বয়সটি উত্তেজনার, প্রবল আবেগ ও উচ্ছ্বাসে জবিনের ঝুঁকি নেবার উপযোগী। এ বয়স অদম্য দুঃসাহসে সকল বাধা-বিপদকে পেরিয়ে যাওয়ার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত। এ বয়সের ধর্মই হলো আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া, আঘাত-সংঘাতের মধ্যে রক্তশপথ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। পাশাপাশি সমাজজীবনের নানা বিকার, অসুস্থতা ও সর্বনাশের অভিঘাতে এ বয়স হয়ে উঠতে পারে ভয়ংকর।

কিন্তু এ বয়সের আছে সমস্ত দুর্যোগ আর দুর্বিপাক মোকাবিলা করার অদম্য প্রাণশক্তি। ফলে তারুণ্য ও রচনার স্বপ্ন এবং কল্যাণব্রত-এসব বৈশিষ্ট্যের জন্য কবি প্রত্যাশা করেছেন নানা সমস্যাপীড়িত দেশে তারুণ্য ও যৌবনশক্তি যেন কাজীয় জীবনের চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়। ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

সেই অস্ত্র

আহসান হাবীব

কবি পরিচিতি

আহসান হাবীব বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের পিরোজপুর জেলার শংকরপাশা গ্রামে ১৯১৭ খিস্টাব্দের দোসরা জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হামিজুদ্দিন হাওলাদার এবং মাতার নাম জমিলা খাতুন। স্কুল জীবনেই তাঁর কবিতা লেখার হাতেখড়ি। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় কবিকে কলেজ ছেড়ে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় চলে আসতে হয়। পত্রিকা, রেডিও, প্রকাশনা সংস্থা প্রভৃতি পেশার সঙ্গে যুক্ত হলেও আহসান হাবীব শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকতা, বিশেষ করে পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক হিসেবেই জীবিকা অর্জনের পথ বেছে নেন। ১৯০৫-এর দিকে তিনি কলকাতা ছেড়ে ঢাকা আসেন বেশ কয়েকটি পত্রিকার কাজ করার পরে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি যোগ দেন ‘দৈনিক বাংলা’ (তৎকালিন ‘দৈনিক পাকিস্তান’) পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে। আমৃত্যু এই পত্রিকার সঙ্গেই তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং ১৯৭৮ খ্রিস্টব্দে একুশে পদকে ভূষিত হন। স্বল্পভাষী, আত্মমগ্ন, স্পষ্টবাদী এই কবি ছিলেন মূলত মানবদরদি শিল্পী। দেশ ও জনতার প্রতি ছিল তাঁর গভীর সংবেদনশীলতা। ব্যক্তিগত অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, যুক্তিবিচারের আলোকে এক সুগভীর জীবনঘনিষ্ঠ আশাবাদী চেতনা তাঁর কবি প্রতিভার মূল সুর। কবি আহসান হাবীবের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হলো: ‘রাত্রিশেষ’, ‘ছায়াহরিণ’, ‘সারা দুপুর’, ‘মেঘ বলে চৈত্রে যাবো’, ‘দুহাতে দুই আদিম পাথর’, ‘বিদীণ© দর্পণে মুখ’ প্রভৃতি। এছাড়াও উপন্যাস ও শিশুসাহিত্যেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল।

তিনি১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

মূলকবিতা

===========

আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও

সভ্যতার সেই প্রতিশ্রুতি

সেই অমোঘ অনন্য অস্ত্র

আমাকে ফিরিয়ে দাও।

সেই অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও

যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে

পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র হবে আনত

যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে

অরণ্য হবে আরও সবুজ

নদী আরও কল্লোলিত

পাখিরা নীড়ে ঘুমোবে।

যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে

ফসলের মাঠে আগুন জ্বলবে না

খাঁ খাঁ করবে না গৃহস্থালি।

সেই অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও

যে অস্ত্র ব্যাপ্ত হলে

নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরবে না

মানব বসতির বুকে

মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত

লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে না পঙ্গু-বিকৃত

আমাদের চেতনা জুড়ে তারা করবেনা আর্তনাদ

সেই অস্ত্র উত্তোলিত হলে

বার বার বিধ্বস্ত হবে না ট্রয়নগরী।

আমি সেই অবিনাশী অস্ত্রের প্রত্যাশী

যে ঘৃণা বিদ্বেষ অহংকার

এবং জাত্যভিমানকে করে বার বার পরাজিত।

যে অস্ত্র আধিপত্যের লোভকে করে নিশ্চিহ্ন

যে অস্ত্র মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না

করে সমাবিষ্ট

সেই অমোঘ অস্ত্র-ভালোবাসা

পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করো।

শব্দার্থ ও টীকা

[illegible] অমোঘ-অব্যর্থ, সার্থক, অবশ্যম্ভাবী।

[illegible] যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে/পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র /হবে আনত-কবি ভালোবাসার আর শান্তির অস্ত্র দিয়ে সকল মারণাস্ত্রকে পরাভূত করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন।

[illegible] যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে/ফসলের মাঠে আগুন /জ্বলবে না-কবি বিশ্বাস করেন, ভালোবাসা দিয়ে মানুষের হিংসা বিদ্বেষ দূর করা সম্ভব। ভালোবাসা থাকলে মানুষ শত্রু ভাববে না, কৃষকের দুঃখ-জ্বালার আসান হবে এবং বিদ্রোহের আগুন জ্বলবে না।

[illegible] যে অস্ত্র ব্যাপ্ত হলে/নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে/আগুন ঝরবে না-কবি এখানে যুদ্ধে ব্যবহৃত ছোট-বড় ক্ষেপণাস্ত্রের কথা বুঝিয়েছেন। কবি চান, মানুষ যেন ভয়াবহতায় জড়িয়ে না পড়ে, বিশ্বে যেন শান্তি নিশ্চিত হয়।

[illegible] মানব বসতির বুকে মুহূর্তের/অগ্ন্যুৎপাত লক্ষ লক্ষ মানুষকে /করবে পঙ্গু-বিকৃত-ভালোবাসাহীন বিদ্বেষপূর্ণ পৃথিবীতে যুদ্ধের অনিবার্য ক্ষতি সম্পর্কে নিজের উৎকণ্ঠা কবি এখানে প্রকাশ করেছেন। অনুমান করা যায়, কবিচৈতন্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকিতে ঘটে যাওয়ার নৃশংসতার স্মৃতি জাগ্রত ছিল। তাই আণবিক বোমার আঘাতে মৃত কিংবা প্রজন্ম-পরম্পরায় পঙ্গুত্ব বরণকারী বহু মানুষের আর্তনাদ কবির এই যুদ্ধবিরোধী মননকে আন্দোলিত করেছে।

[illegible] ট্রয়নগরী - প্রাচীন গ্রিসের স্থাপত্যকলায় নন্দিত এক শহর। মানুষের হিংসা-বিদ্বেষ ঈর্ষা আর দম্ভের শিকার হয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে বারংবার ধ্বংস হয়েছে এই নগরী। যুদ্ধের নির্মমতার এক চিরায়ত দৃষ্টান্ত এই ট্রয়।

[illegible] জাত্যভিমান- কোন যুক্তি ছাড়াই নিজ জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করার অহংকারী মনোভাব।

[illegible] সমাবিষ্ট - সমভাবে আবিষ্ট। সমাবেশ হয়েছে এমন; সমবেত হওয়া অর্থে।

পাঠ-পরিচিতি

œসেই অস্ত্র” কবিতাটি আহসান হাবীবের ‘বিদীর্ণ দর্পণে মুখ’ কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। এই কবিতায় কবির একমাত্র প্রত্যাশা-ভালোবাসা নামের মহান অস্ত্রকে পুনরায় এই মানবসমাজে ফিরিয়ে পাওয়া। কবির কাছে ভালোবাসা কেবল কোনো আবেগ কিংবা অনুভূতির দ্যোতনা জাগায় না। তাঁর বিশ্বাস, এটি মানুষকে সকল অমঙ্গল থেকে পরিত্রাণের পথ বাতলে দেয়। তাই কবি বিশ্বের মানবকুলের কাছেই এই ভালোবাসা ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ করেছেন। মানুষ যদি অপর মানুষের হিংসা, লোভ, ঈর্ষা থেকে মুক্ত থাকে তবে পৃথিবীতে বিরাজ করবে শান্তি; পৃথিবী এগিয়ে যাবে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা বিদ্বেষের বিষবাষ্পকে যদি অপসারণ করতে হয় তবে ভালোবাসা নামক অস্ত্রকে কবির কাছে এবং কবির মতো আরও বহু মানুষের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। কবি জানেন, হিংসা আর স্বার্থপরতার করাল গ্রাসে অনেকেই মানবিকতাশূন্য হয়ে পড়ে। আর তাই কবি মানবিকতার সেই হৃতবোধকে ফিরে পেতে চান তথা মানব সমাজে ফিরিয়ে দিতে চান। পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে চান অফুরান ভালোবাসা। কবিতাটির গঠনগত বিশেষত্ব হলো, এর অনাড়ম্বর সহজ গতিময়তা। কোন ভারি শব্দ ব্যবহার না করে সাবলীল ভাষায় কবি তাঁর একান্ত প্রত্যাশিত ভালোবাসার প্রত্যাবর্তন কামনা করেছেন। রচিত কবিতাটি শান্তিপ্রিয় পৃথিবীবাসীর জন্য এক চিরায়ত প্রার্থনাসংগীত। কবিতাটি অনন্ত্যমিলহীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর পর্বগুলোর বিন্যাসও অসম।

বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবি পরিচিতি

আধুনিক বাংলা কবিতার অগ্রদূত মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫এ জানুয়ারি যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত, জননী জাহ্নবী দেবী।

=

মায়ের তত্ত্বাবধানে গ্রামেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়। মধুসূদন ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার হিন্দু কলেজের সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। সেখানে ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর সাহিত্য প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে তিনি পিতৃপ্রদত্ত নামের শুরুতে 'মাইকেল' নাম যোগ করেন। ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে তাঁকে হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করে শিবপুরের বিশপ্স কলেজে ভর্তি হতে হয়। এখানেই তিনি গ্রিক, লাতিন ও হিব্রু ভাষা শিক্ষার সুযোগ পান। মধুসূদন বুৎপন্ন ছিলেন বহু ভাষার। ইংরেজি ও সংস্কৃতিসহ ফরাসি, জার্মান ও ইতালীয় ভাষাতেও তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

=

হিন্দু কলেজে ছাত্রাবস্থায় তাঁর সাহিত্যচর্চার মাধ্যম ছিল ইংরেজি ভাষা। কিন্তু বিদেশি ভাষার মোহ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি মাতৃভাষার কাছে ফিরে আসেন। মাতৃভাষা বাংলা রচিত অমর কাব্যের তিনি স্রষ্টা। রোমান্টিক ও ধ্রুপদী সাহিত্যের আশ্চর্য মিলন ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে। দেশপ্রেম, স্বাধীনতা চেতনার এবং নারী-জাগরণ মধুসূদনের সাহিত্যের প্রধান সুর। মধুসূদন-পূর্ব হাজার বছরের বাংলা কবিতার ছন্দ ছিল পয়ার। একটি চরণের শেষে আর একটি চরণের মিল ছিল ওই ছন্দের অনড় প্রথা। মধুসূদন বাংলা কবিতার এ প্রথাকে ভেঙে দিলেন। তিনি প্রথম চরণের সঙ্গে দ্বিতীয় চরণের মিল রক্ষা করেননি বলেই তাঁর প্রবর্তিত ছন্দকে বলা হয় 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' । তবে এটি বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই নবরূপায়ণ। তাঁর শ্রেষ্ঠতম কীর্তি 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' এ ছন্দের সফল প্রয়োগ ঘটে। এ ছন্দে আরও কিছু নতুন বিষয় তিনি যোগ করেছিলেন বলে একে বলা হয় '১৪ মাত্রার অমিল প্রবহমান যতি স্বাধীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দ' । বাংলায় চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেটেরও প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বাংলা নাটকের উদ্ভবযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তিনি। আধুনিক নাটক 'শর্মিষ্ঠা' , 'পদ্মাবতী' ও 'কৃষ্ণকুমারী' ও প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলো হলো : তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলি।

.

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯এ জুন কলকাতায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত মৃত্যুবরণ করেন।

.

æএতক্ষণে” -অরিন্দম কহিলা বিষাদে,

æজানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল

রক্ষপুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব

এ কাজ? নিকষা সতী তোমার জননী!

সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ! শূলিশম্ভুনিভ

কুম্ভকর্ণ! ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী!

নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?

চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?

কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি

পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,

পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,

লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।”

উত্তরিলা বিভীষণ, æবৃথা এ সাধনা,

ধীমান্। রাঘবদাস আমি; কী প্রকারে

তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে

অনুরোধ?” উত্তরিলা কাতরে রাবণি;-

æহে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!

রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে

আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!

স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে;

পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি

ধূলায়? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে

কে তুমি? জনম তব কোন মহাকুলে?

.

কে বা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে

করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে

যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,

শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী,

কবে, হে বীরকেশরী, সম্ভাষে শৃগালে

মিত্রভাবে? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,

অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।

ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে

অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?

কহ, মহারথী, এ কি মহারথীপ্রথা?

নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে

এ কথা! ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া

এখনি! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,

বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি!

দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছে,

রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের! কী দেখি

ডরিবে এ দাস হেন দুর্বল মানবে?

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্ভে পশিল

দম্ভী; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।

তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে

বনবাসী! হে বিধাতঃ নন্দন-কাননে

ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে

কীটবাস? কহ তাত, সহিব কেমনে?.

হেন অপমান আমি,-ভ্রাতৃ-পুত্র তব?

তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?”

মহামন্ত্র-বলে যথা নরশিরঃ ফণী,

মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী

রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে;

æনহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা ভর্ৎস মোরে

তুমি! নিজ কর্ম-দোষে, হায়, মজাইলা

এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি!

বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে

পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী; প্রলয়ে যেমতি

বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে!

রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী

তেঁই আমি। পরদোষে কে চাহে মজিতে?”

রুষিলা বাসবত্রাস! গম্ভীরে যেমতি

নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,

কহিলা বীরেন্দ্র বলী,- æধর্মপথগামী,

হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে

তুমি;- কোন্ ধর্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,

জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি, - এ সকলে দিলা

জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি

পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি

নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!

এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে?

কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে,

হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে?

গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।”

- লক্ষি-লক্ষ করে।
- ভর্ৎস-ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করছ।
- মজাইলা-বিপদস্র করলে।
- বসুধা-পৃথিবী।
- তেঁই-তজ্জন্য। সেহেতু।
- রুষিলা- রাগান্বিত হলো।
- বাসবত্রাস-বাসবের ভয়ের কারণ যে মেঘনাদ।
- মন্দ্র-শব্দ। ধ্বনি।
- জীমূতেন্দ্র-মেঘের ডাক বা আওয়াজ।
- বলী- বলবান। বীর।
- জলাঞ্জলি-সম্পূর্ণ পরিত্যাগ।
- শাস্ত্রে বলে,...পর পরঃ সদা! -শাস্ত্রমতে গুণহীন হলেও নির্গুণ স্বজনই শ্রেয়, কেননা গুণবান হলেও পর সর্বদা পরই থেকে যায়।
- নীচ-হীন। নিকৃষ্ট। ইতর।
- দুর্মতি-অসৎ বা মন্দ বুদ্ধি।

পাঠ-পরিচিতি

============

‘বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ’ কাব্যাংশটুকু মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’ র ‘বধো’ (বধ) নামক ষষ্ঠ সর্গ থেকে সংকলিত হয়েছে। সর্বমোট নয়টি সর্গে বিন্যস্ত ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’ র ষষ্ঠ সর্গে লক্ষ্মণের হাতে অন্যায় যুদ্ধে মৃত্যু ঘটে অসমসাহসী বীর মেঘনাদের। রামচন্দ্র কর্তৃক দ্বীপরাজ্য স্বর্ণলঙ্কা আক্রান্ত হলে রাজা রাবণ শত্রুর উপর্যুপরি দৈব-কৌশলের কাছে অসহায় হয়ে পড়েন। ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুর পর মেঘনাদকে পিতা রাবণ পরবর্তী দিবসে অনুষ্ঠেয় মহাযুদ্ধের সেনাপতি হিসেবে বরণ করে নেন। যুদ্ধজয় নিশ্চিত করার জন্য মেঘনাদ যুদ্ধযাত্রার পূর্বেই নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবতা অগ্নিদেবের পূজা সম্পন্ন করতে মনস্থির করে। মায়া দেবীর আনুকূল্যে এবং রাবণের অনুজ বিভীষণের সহায়তায়, লক্ষ্মণ শত শত প্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশে সমর্থ হয়। কপট লক্ষ্মণ নিরস্ত্র মেঘনাদের কাছে যুদ্ধ প্রার্থনা করলে মেঘনাদ বিস্ময় প্রকাশ করে। শত শত প্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণের অনুপ্রবেশ যে মায়াবলে সম্পন্ন হয়েছে, বুঝতে বিলম্ব ঘটে না তার। ইতোমধ্যে লক্ষ্মণ তলোয়ার কোষমুক্ত করলে মেঘনাদ যুদ্ধসাজ গ্রহণের জন্য সময় প্রার্থনা করে লক্ষ্মণের কাছে। কিন্তু লক্ষ্মণ তাকে সময় না দিয়ে আক্রমণ করে। এ সময়ই অকস্মাৎ যজ্ঞাগারের প্রবেশদ্বারের দিকে চোখ পড়ে মেঘনাদের; দেখতে পায় বীরযোদ্ধা পিতৃব্য বিভীষণকে। মুহূর্তে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যায় তার কাছে। খুল্লতাত বিভীষণকে প্রত্যক্ষ করে দেশপ্রেমিক নিরস্ত্র মেঘনাদ যে

প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, সেই নাটকীয় ভাষ্যই 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' অংশে সংকলিত হয়েছে। এ অংশে মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়েছে ঘৃণা। জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও জাতিসত্তার সংহতির গুরুত্বের কথা যেমন এখানে ব্যক্ত হয়েছে তেমনি এর বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্রকে অভিহিত করা হয়েছে নীচতা ও বর্বরতা বলে।

.

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাল্মীকি-রামায়ণকে নবমূল্য দান করেছেন এ কাব্যে। মানবকেন্দ্রিকতাই রেনেসাঁস বা নবজাগরণের সংকেত। ঐ নবজাগরণের প্রেরণাতেই রামায়ণের রাম-লক্ষ্মণ মধুসূদনের লেখনীতে হীনরূপে এবং রাক্ষসরাজ রাবণ ও তার পুত্র মেঘনাদ যাবতীয় মানবীয় গুণের ধারকরূপে উপস্থাপিত। দেবতাদের আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাম-লক্ষ্মণ নয়, পুরানের রাক্ষসরাজ রাবণ ও তার পুত্র মেঘনাদের প্রতিই মধুসূদনের মমতা ও শ্রদ্ধা। পঙ্ক্তি

.

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশটি ১৪ মাত্রায় অমিল প্রবহমান যতিস্বাধীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রথম পঙ্ক্তির সঙ্গে দ্বিতীয় পঙ্ক্তির চরণান্তের মিলহীনতার কারণে এ ছন্দ 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' নামে সমাধিক পরিচিত। এ কাব্যাংশের প্রতিটি পঙ্ক্তি ১৪ মাত্রায় এবং ৮+৬ মাত্রার দুটি পর্বে বিন্যস্ত। লক্ষ করার বিষয় যে, এখানে দুই পঙ্ক্তির চরণান্তিক মিলই

কেবল পরিহার করা হয়নি। যতিপাত বা বিরামচিহ্নের স্বাধীন ব্যবহারও হয়েছে বিষয় বা বক্তব্যের অর্থের অনুষঙ্গে। একারণে ভাবপ্রকাশের প্রবহমানতাও কাব্যাংশটির ছন্দের বিশেষ লক্ষণ হিসেবে বিবেচ্য।

ঐকতান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবি পরিচিতি

অসামান্য প্রতিভার অধিকারী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) আধুনিক বাংলা কবিতার প্রাণপুরুষ। তাঁর সাহিত্যসাধনার একটি বৃহৎকাল বাংলা সাহিত্যের 'রবীন্দ্রযুগ' নামে পরিচিত। মানবধর্মের জয় ও সৌন্দর্য-তৃষ্ণা রোমান্টিক এই কবির কবিতার মূলসুর। কবিতা ছাড়াও ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনি ও সংগীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ কালজয়ী প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন। তিনি ছিলেন অনন্য চিত্রশিল্পী, অনুসন্ধিৎসু বিশ্বপরিব্রাজক, দক্ষ সম্পাদক এবং অসামান্য শিক্ষা সংগঠক ও

চিন্তক। নিজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণে নিরুৎসাহী হলেও 'বিশ্বভারতী' নামের বিশ্ববিদ্যালয়-এর তিনি স্বাপ্নিক ও প্রতিষ্ঠাতা। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনুফুল' প্রকাশিত হয়। 'গিতাঞ্জলী' এবং অন্যান্য কবিতার সমন্বয়ে স্ব-অনুদিত 'সং অফারিংস' গ্রন্থের জন্য ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম এশীয় হিসেবে তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। বাংলা ছোটগল্পের তিনি পথিকৃৎ ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী। মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, ক্ষণিক, বলাকা, পুনশ্চ, জন্মদিন, শেষ লেখা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। কাব্যনাট্য 'বিসর্জন' ও 'চিত্রাঙ্গদা' এবং কাহিনি কবিতা সংকলন 'কথা ও কাহিনি' তাঁর ভিন্ন স্বাদের রচনা।

মূলকবিতা

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।

দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী-

মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,

কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু

রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;

মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।

সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে

অক্ষয় উৎসাহে-

যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী

কুড়াই আনি।

জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে

পূরণ করিয়া লই যত পানি ভিক্ষালব্ধ ধনে।

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি

আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি,

এই স্বরসাধণায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক-

রয়ে গেছে ফাঁক।

প্রকৃতির ঐকতানস্রোতে

নানা কবি ঢালে গান নানা দিক হতে;

তাদের সবার সাথে আছে মোর এইমাত্র যোগ-

সঙ্গ পাই সবাকার, লাভ করি আনন্দের ভোগ,

পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,

বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।

চাষি খেতে চালাইছে হাল,

তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল-

বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার

তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।

মূলকবিতা-২

অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে

সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।

মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,

ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।

জীবনে জীবন যোগ করা

না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।

তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা

আমার সুরের অপূর্ণতা।

আমার কবিতা, জানি আমি,

গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,

কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,

যে আছে মাটির কাছাকাছি,

সে কবির-বাণী-লাগি কান পেতে আছি।

এসো কবি অখ্যাতজনের

নির্বাক মনের।

মর্মের বেদনা যত করিয়া উদ্ধার-

প্রাণীহন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারি ধান,

অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরু ভূমি

রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।

অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি

সাহিত্যের ঐকতানসংগীতসভায়

একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়-

মূক যারা দুঃখে সুখে,

নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,

ওগো গুণী,

কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।

শব্দার্থ ও টীকা

[illegible] বিপুলা-বিশাল প্রশস্ত। এখানে নারীবাচক শব্দ হিসেবে বিপুলা বলে পৃথিবীকে বোঝানো হয়েছে।

[illegible] ‘বিশাল বিশ্বের আয়োজন; মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।’ -জীব ও জড়-বৈচিত্র্যের বিশাল সম্ভার নিয়ে এই বিশাল বিশ্বজগৎ। কিন্তু কবির মন জুড়ে রয়েছে তারই ছোট একটি কোণ।

[illegible] ‘যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী কুড়াইয়া আনি।’ -কবি তাঁর কবিতাকে সমৃদ্ধ করার জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সম্পদ কুড়িয়ে আনেন।

[illegible] জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।’ -নানা সূত্র থেকে জ্ঞান আহরণ করে কবি নিজের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেন।

[illegible] স্বরসাধনা-এখানে সূর বা সংগীত সাধণা বোঝানো হয়েছে।

[illegible] ‘এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক রয়ে গেছে ফাঁক।’ -কাব্যসংগীতের ক্ষেত্রে কবি যে স্বরসাধনা করেছে তাতে ঘাটতি রয়ে গেছে। ঐকতান-বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ে সৃষ্ট সুর, সমস্বর। এখানে বহু সুরের সমন্বয়ে এক সুরে বাঁধা পৃথিবীর সুরকে বোঝানো হয়েছে।

[illegible] ‘অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের, চিরনির্বাসনে সমাজের উচ্চ মঞ্চে, বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।’ -সম্মানবঞ্চিত ব্রাত্যজনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজের উচ্চ মঞ্চে কবি আসন গ্রহণ করেছেন। তাই সেখানকার সংকীর্ণ জানালা দিয়ে বৃহত্তর সমাজ ও জীবনকে তিনি দেখতে পারেন নি।

[illegible] ‘মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গনের ধারে, ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।’ -মাঝে মধ্যে কবি ব্রাত্য মানুষের পাড়ায় ক্ষণিকের জন্য উঁকি দিয়েছেন। কিন্তু নানা সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের সঙ্গে ভালোভাবে যোগসূত্র রচনা সম্ভব হয়নি।

[illegible] ‘জীবনে জীবন যোগ করা না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।’ -জীবনের সঙ্গে জীবনে সংযোগ ঘটাতে না পারলে শিল্পীর সৃষ্টি কৃত্রিম পণ্যে পরিণত হয়। ব্রাত্য তথা প্রান্তিক মানুষকে শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে যোগ্য স্থান দিলেই তবে শিল্প সাধনা পূর্ণতা পায়।

[illegible] ‘এসো কবি অখ্যাতজনের নির্বাক্ মনের’ -রবীন্দ্রনাথ এখানে সেই অনাগত কবিকে আহ্বান করেছেন, যিনি অখ্যাত মানুষের, অব্যক্ত মনের জীবনকে আবিষ্কার করতে সমর্থ হবেন।

[illegible] রস-এখানে সাহিত্যরস বা শিল্পরস বোঝানো হয়েছে। কবিরা রসসৃষ্টির জন্য কবিতা রচনা করেন। সেই রস সৃষ্টি হয় পাঠকের অন্তরে।

[illegible] ‘অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ, সেই মরু ভূমির রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।’ -জেলে-তাঁতি প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষ সাহিত্যের বিষয়সভায় উপেক্ষার কারণে স্থানলাভে বঞ্চিত হওয়ায় সাহিত্যের ভুবন আনন্দহীন উষর মরু ভূমিতে পরিণত হয়েছে। মরু ভূমির সেই উষরতাকে রসে পূর্ণ করে দেওয়ার জন্য ভবিষ্যতের কবির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আহ্বান।

[illegible] উদ্বারি-ওপরে বা ঊর্ধ্বে প্রকাশ করে দাও। অন্তরে যে উৎস (এখানে রসের উৎস) রয়েছে, তা উন্মুক্ত করে দেওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে।

[illegible] সাহিত্যের ঐকতান সংগীত সভায়-সাহিত্যে জীবনের সর্বপ্রান্তস্পর্শী সমস্বর বা ঐকতান।

[illegible] 'একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়' -অবজ্ঞাত বা উপেক্ষিত মানুষও যেন সম্মান লাভ করে সে-কথা বলা হয়েছে।

[illegible] 'মূক যারা দুঃখে সুখে, নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে' -দুঃখ-সুখ সহ্য করা নির্বাক মানুষ, যারা এগিয়ে চলা পৃথিবীতে এখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না।

পাঠ-পরিচিতি

æঐকতান” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের ১০ সংখ্যক কবিতা। কবির মৃত্যুর মাত্র চার মাস আগে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখ 'জন্মেদিনে' কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রবাসী' তে কবিতাটি æঐকতান” নামে প্রথম প্রকাশিত হয়। æঐকতান” অশীতিপর স্থিতপ্রজ্ঞ কবির আত্ম-সমালোচনা; কবি হিসেবে নিজের অপূর্ণতার স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তি।

দীর্ঘ জীবন-পরিক্রমণের শেষপ্রান্তে পৌঁছে স্থিতপ্রজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ পেছন ফিরে তাকিয়ে সমগ্র জীবনের সাহিত্যসাধনার সাফল্য ও ব্যথতার হিসাব খুঁজেছেন æঐকতান” কবিতায়। তিনি অকপটে নিজের সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতার কথা ব্যক্ত করেছেন এখানে। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কবি অনুভব করেছেন নিজের অকিঞ্চিৎকরতা ও ব্যর্থতার স্বরূপ। কবি বুঝতে পেরেছেন, এই পৃথিবীর অনেক কিছুই তাঁর অজানা ও অদেখা রয়ে গেছে। বিশ্বের বিশাল আয়োজনে তাঁর মন জুড়ে ছিল

কেবল ছোট একটি কোণ। জ্ঞানের দীনতার কারণেই নানা দেশের বিত্রি অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন গ্রন্থের চিত্রময় বর্ণনার বাণী কবি ভিক্ষালব্ধ ধনের মতো সযত্নে আহরণ করে নিজের কাব্যভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন। তবু বিপুল এ পৃথিবীর সর্বত্র তিনি প্রবেশের দ্বার খুঁজে পাননি। চাষি ক্ষেতে হাল চষে, তাঁতি তাঁত বোনে, জেলে জাল ফেলে-এসব শ্রমজীবী মানুষের ওপর ভর করেই জীবনসংসার এগিয়ে চলে। কিন্তু কবি এসব হতদরিদ্র অপাঙেক্তয় মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে সমাজের উচ্চমঞ্চে আসন গ্রহণ করেছিলেন। সেখানকার সংকীর্ণ জানালা দিয়ে যে জীবন ও জগৎকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তা ছিল খণ্ডিত তথা অপূর্ণ। ক্ষুদ্র জীবনের সঙ্গে বৃহত্তম মানব-জীবনধারা ঐকতান সৃষ্টি না করতে পারলে শিল্পীর গানের পসরা তথা সৃষ্টি সম্ভার যে কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হয়ে ব্যর্থ হয়ে যায়, কবিতায় এই আত্মোপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে কবির। বলেছেন তিনি, তাঁর কবিতা বিচিত্র পথে অগ্রসর হলেও জীবনের সকল স্তরে পৌঁছাতে পারেনি। ফলে, জীবন-সায়াহ্নে কবি অনাগত ভবিষ্যতের সেই মৃত্তিকা-সংলগ্ন মহৎ কবিরই আবির্ভাব প্রত্যাশা করেছেন, যিনি শ্রমজীবী মানুষের অংশীদার হয়ে সত্য কর্মের মধ্যে সৃষ্টি করবেন আত্মীয়তার বন্ধন। æঐকতান” কবিতায় যুগপৎ কবির নিজের এবং তাঁর সমকালীন বাংলা কবিতার বিষয়গত সীমাবদ্ধতার দিক উন্মোচিত হয়েছে।

কবিতাটি সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। কবিতাটিতে ৮+৬ এবং ৮+১০ মাত্রার পর্বই অধিক। তবে এতে কখনো-কখনো ৯ মাত্রার অসমপর্ব এবং ৩ ও ৪ মাত্রার অপূর্ণ পর্ব ব্যবহৃত হয়েছে।

সাম্যবাদী

কাজী নজরুল ইসলাম

লেখক পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলা কাব্যজগতের এক অনন্য শিল্পী। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি। মাত্র আট বছর বয়সে পিতাকে হারিয়ে করিব পরিবার চরম দারিদ্র্যে পতিত হয়। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৯ সালে) গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পাস করে সেখানেই এক বছর শিক্ষাকতা করেন নজরুল। বারো বছর বয়সে তিনি লেটোর দলে যোগ দেন এবং দলের জন্য পালাগান রচনা করেন। বস্তুত তখন থেকেই তিনি সৃষ্টিশীল সত্তার অধিকারী হয়ে ওঠেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪) শুরু হওয়ার পর ১৯১৭ সালে ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে সৈনিক হিসেবে তিনি যোগদান করেন এবং করাচিতে যান; পরে হাবিলদার পদে উন্নিত হন।

১৯২০ সালের শুরুতে বাঙালি পল্টন ভেঙে দিলে তিনি কলকাতায় আসেন এবং পরিপূর্ণভাবে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। সাপ্তাহিক 'বিজলী' র সংখ্যায় 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হলে চারদিকে তাঁর কাবিখ্যাতি বিস্তার লাভ করে এবং তিনি 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি নবযুগ ও ধূমকেতুসহ বহু পত্র-পত্রিকার সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

তাঁর বিখ্যাত কাব্যসমূহ : অগ্নি-বীণা, বিষের-বাশি, সাম্যবাদী, বর্সহারা, সিন্দু হিন্দোল, চক্রবাক, সন্ধ্যা, প্রলয়-শিখা। এছাড়াও তিনি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। অসংখ্য সংগীতের স্রষ্টা নজরুল। দেশাত্মবোধক গান, শ্যামাসংগীত, গজল রচনায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ (১৯৬০) উপাধিতে ভূষিত করে। 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক, একুশে পদকসহ অসংখ্যক পুরস্কার ও সম্মাননায় তিনি ভূষিত হন।

.

মূলকবিতা

===============

গাহি সাম্যের গান-

যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,

যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।

গাহি সাম্যের গান!

কে তুমি?- পার্সী? জৈন? ইহুদী ? সাঁওতাল, ভীল, গারো?

কনফুসিয়াস? চার্বাক-চেলা? বলে যাও, বল আরো!

বন্ধু, যা খুশি হও,

পেটে-পিঠে, কাঁধে-মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,

কোরান-পুরান-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক-

জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থ-সাহেব পড়ে যাও যত সখ,-

কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?

দোকানে কেন এ দর-কষাকষি?- পথে ফোটে তাজা ফুল!

তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,

সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ!

তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,

তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।

কেন খুঁজে ফের দেবতা-ঠাকুর মৃত-পুঁথি-কঙ্কালে?

হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে!

বন্ধু, বলিনি ঝুট,

এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।

এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,

বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন,

মস্জিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,

এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।

এই রণ-ভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,

এই মাঠে হল মেষের রাখাল নবিরা খোদার মিতা।

এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি

ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি'।

এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান,

এইখানে বসি' গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান!

মিথ্যা শুনিনি ভাই,

এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই।

শব্দার্থ ও টীকা

[illegible] সাম্য-সমদর্শিতা। সমতা।

[illegible] সাম্যবাদ-জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল মানুষের সমান অধিকার থাকা উচিত এই মতবাদ।

[illegible] পার্সি-পারস্যদেশের বা ইরানের নাগরিক।

[illegible] জৈন-জিন বা মহাবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতাবলম্বী জাতি।

[illegible] জেরুজালেম-বায়তুল মোকাদ্দাস। ফিলিস্তিনে অবস্থিত এই স্থানটি মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের নিকট সমভাবে পুণ্যস্থান।

[illegible] মসজিদ এই .... এই হৃদয়-মানুষের হৃদয়ই মসজিদ, মন্দির গির্জা বা অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রের মতো পবিত্র।

[illegible] বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা-হিন্দুধর্মের অবতার শ্রীকৃষ্ণের মুখনিশ্রিত বাণীই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

[illegible] শাক্যমুনি -শাকবংশে জন্ম যাল। বুদ্ধদেব।

[illegible] কন্দরে - পর্বতের গুহা। (হৃদয়ের) গভীর গোপন স্থান।

[illegible] আরব-দুলাল- হযরত মুহাম্মদ (স)।

[illegible] কোরানের সাম-গান-পবিত্র কোরানের সাম্যের বাণী।

পাঠ-পরিচিতি

আবদুল কাদির সম্পাদিত বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'নজরুল রচনাবলি' প্রথম খণ্ড থেকে 'সাম্যবাদী' কবিতাটি সংকরণ করা হয়েছে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'সাম্যবাদী' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত এ কবিতাটিতে বৈষম্যবিহীন অসাম্প্রদায়িক মানব সমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে। কবি এই 'সাম্যের গান' গেয়েই গোটা মানব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে আগ্রহী। কবির বিশ্বাস মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে পরিচিত হয়ে ওঠার চেয়ে সম্মানের আর কিছু হতে পারে না। নজরুলের এই আদর্শ আজও প্রতিটি সত্যিকার মানুষের জীবনপথের প্রেরণা। কিন্তু মানুষ এখনও

সম্প্রদায়কে ব্যবহার করে রাজনীতি করছে, মানুষকে শোষণ করছে, একের বিরুদ্ধে অন্যকে উস্কে দিচ্ছে। ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীর দোহাই দিয়ে মানুষকে পরস্পর থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। নজরুল এই কবিতায় সুস্পষ্টভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: মানুষেরই মাঝে স্বর্গ-নরক মানুষেতে সুরাসুর। তাই তিনি জোর দেন অন্তর-ধর্মের ওপর। ধর্মগ্রন্থ পড়ে যে জ্ঞান মানুষ আহরণ করতে পারে, তাকে যথোপযুক্তভাবে উপলব্ধি করতে হলো প্রয়োজন প্রগাঢ় মানবিকতাবোধ। মানুষের হৃদয়ের চেয়ে যে শ্রেষ্ঠ কোনো তীর্থ নেই, এই প্রতীতি কবির স্বোপার্জিত অনুভব। এ কারণেই কবি মানবিক মেলবন্ধনের এক অপূর্ব সংগীত পরিবেশন করতে আগ্রহী। এ গানে মানুষে মানুষে সব ব্যবধান ঘুচে যাবে। মানবতার সুবাস ছড়ানো আত্মার উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এই জীবনকে পবিত্রতম করে তোলা সম্ভব, এই মর্মবাণীকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়াই এই কবিতায় নজরুলের অন্বিষ্ট।

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে

জীবনানন্দ দাশ

কবি পরিচিতি

আধুনিক বাংলা কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশ। ১৮৯৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তিনি বরিশালে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা সত্যানন্দ দাশ ছিলেন বরিশালে ব্রজমোহন স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং মা কুসুমকুমারী দাশ ছিলেন সেকালের বিখ্যাত কবি। মায়ের কাছ থেকে তিনি কবিতা লেখার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। স্বল্প সময়ের জন্য বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করলেও মূলত ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবেই তিনি জীবন আতিবাহিত করেন।

কবি জীবনানন্দ দাশ কবিতায় সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভবের এক জগৎ তৈরি করেন। বিশেষ করে গ্রাম বাংলার নিসর্গের যে ছবি তিনি এঁকেছেন, বাংলা সাহিত্যে তাঁর তুলনা চলে না। সেই নিসর্গের সঙ্গে অনুভব ও বোধের বহুতর মাত্রা যুক্ত হয়ে তাঁর হাতে অনন্য সাধারণ কবিতাশিল্প রচিত হয়েছে। এই অসাধারণ কাব্যবৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চিত্ররূপময়' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়াও ব্যক্তিমানুষের নিঃসঙ্গতা, আধুনিক জীবনের বিচিত্র যন্ত্রণা ও হাহাকার এবং সর্বোপরি জীবন ও জগতের রহস্য ও মাহাত্ম্য সন্ধানে তিনি এক অপ্রতিম কবিভাষা সৃষ্টি করেছেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁকে আখ্যায়িত করেছেন 'নির্জনতম কবি' বলে। উপমা, চিত্রকল্প, প্রতীক সৃজন, আলো-আধারের ব্যবহার, রঙের ব্যবহার এবং অনুভবের বিচিত্র মাত্রার ব্যবহারে তার কবিতা লাভ করেছে অসাধারণত্ব। তাঁর নিসর্গবিষয়ক কবিতা বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সংগ্রামী

জনতাকে তীব্রভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক হিসেবেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ স্থান রয়েছে। জবিনানন্দের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ: 'ঝড়া পালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী', ' বেলা অবেলা কালবেলা', 'রূপসী বাংলা'। 'কবিতার কথা' তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ এবং 'মাল্যবান' ও 'সুতীর্থ' তাঁর বিখ্যাত দুটি উপন্যাস।

জীবনান্দ দাশ ১৯৫৪ সালের ২২-এ আক্টোবর কলকাতায় ট্রাম দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন।

.

মূলকবিতা

=============

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে-সবচেয়ে সুন্দর করুণ:

সেখানে সবুজ ডাঙা ভরে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল

সেখানে গাছের না: কাঁঠাল অশ্বত্থ বট জারুল হিজল

সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ

সেখানে বারুণী তাকে গঙ্গা-সাগরের বুকে-সেখানে বরুণ

কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল

সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল।

সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ

সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকার ঘাসের উপর
সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের পর-
শঙ্খমালা নাম তার : এ বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে
তারে আর খুঁজে তুমি পাবে নাকো-বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর
তাই-সে-জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।

শব্দার্থ ও টীকা

[illegible] এই পৃথিবীতে....সুন্দর করুণ-কবির চোখে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, মমতারসে সিক্ত, সহানুভূতিতে আর্দ্র ও বিষণ্ন দেশ বাংলাদেশ।

[illegible] নাটা-লতাকবঞ্চ; গোলাকার ক্ষুদ্র ফর বা তার বীজ।

[illegible] সেখানে ভোরের... জাগিছে অরুণ -বাংলার প্রভাতের সৌন্দর্য ও রহস্যময়তা আঁকতে গিয়ে ভোরে মেঘের আড়াল থেকে গাঢ় লাল সূর্যের আলো বিচ্ছুরণ যেন ধারণ করেছে করমচা বা করমচা ফুলের রং।

[illegible] বারুণী - বরুণানী। বরুণের স্ত্রী। জলের দেবী।

[illegible] সেখানে বারুণী থাকে.. অবিকল জল -জলে পরিপূর্ণ এদেদেশের অসংখ্য নদী-নালা স্রোত ধারার প্রাণৈশ্বর্য ও সৌন্দর্যের রূপ আঁকা হয়েছে এই পঙিক্ত দুটির মধ্যে।

[illegible] সেইখানে শঙ্গচিল... অস্ফুট, তরুণ-বাংলাদেশ প্রাণী আর প্রকৃতির ঐক্য ও সংহতিতে একাকার। পানের বনে হাওয়ায় যে চঞ্চলতা জেগে ওঠে সেই চঞ্চলতা সম্প্রসারিত হয় দূর আকাশের শঙ্খচিলে। আর মিষ্টি ম্রিয়মাণ তরুণ ধানের গন্ধের মতো লক্ষ্মীপেঁচাও মিলেমিশে থাকে প্রকৃতির পরিবেষ্টনীতে।

[illegible] বিশালাক্ষী - যে রমণীর চোখ আয়ত বা টানাটানা। আয়তলোচনা সুন্দরী নারী।

[illegible] সুদর্শন -এক ধরনের পোকা।

[illegible] বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর -এখানে আয়তলোচনা দেবী দুর্গার কথা বলা হয়েছে।

পাঠ-পরিচিতি

অসাধারণ সুন্দর এই দেশ। সারা পৃথিবীর মধ্যে অনন্য। প্রকৃতির সৌন্দর্যের এমন লীলাভূমি পৃথিবীর কোথাও নেই আর। অসংখ্য বৃক্ষ, গুল্ম ছড়িয়ে আছে এদেশের জনপদে-অরণ্যে। মধুকূপী, কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল তাদেরই কোনো কোনোটির নাম। এদেশের পূর্বকাশে যখন সূর্য ওঠে মেঘের আড়াল থেকে তার রং হয় করঞ্জা রঙিন। আর এদেশের প্রতিটি নদ-নদী ভরে থাকে স্বচ্ছতোয়া জলে। সেই জল ফুরায় না কখনই। জলের দেবতা অনিঃশেষ

জলধারা দিয়ে স্রোতস্বিনী রাখে এদেশের অসংখ্য নদীকে। প্রকৃতি আর প্রাণিকুলের বন্ধনে গড়ে উঠেছে চির-অবিচ্ছেদ্য এক সংহতি। তাই হাওয়া যখন পানের বনে চঞ্চলতা জাগায় তখন দূর আকাশের শঙ্খচিল যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। আর ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট লক্ষ্মীপেঁচাও মিশে থাকে প্রকৃতির গভীরে, অন্ধকারের বিচিত্ররূপ এই দেশে। অন্ধকার ঘাসের ওপর নুয়ে থাকে লেবুর শাখা কিংবা অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে সুদর্শন উড়ে যায়। জন্ম দেয় শঙ্খমালা নামের রূপসী নারীর হলুদ শাড়ির বর্ণশোভা। কবির বিশ্বাস, পৃথিবীর অন্য কোথায় শঙ্খমালাদের পাওয়া যাবে না। কেননা বিশালাক্ষী বর দিয়েছিল বলেই নীল-সবুজে মেশা বাংলার ভূপ্রকৃতির মধ্যে এই অনুপম সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে।

তাহারেই পড়ে মনে

সুফিয়া কামাল

কবি পরিচিতি

সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের বিশিষ্ট্য মহিলা কবি ও নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর জন্ম ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ২০-এ জুন বরিশালে। তাঁর পৈতৃক নিবাস কুমিল্লায়। কবির পিতার নাম সৈয়দ আবদুল বারী এবং মায়ের নাম সাবেরা বেগম। যে সময়ে সুফিয়া কামালের জন্ম তখন বাঙালি মুসলমান নারীদের কাটাতে হতো গৃহবন্ধি জীবন। স্কুল কলেজে পড়ার কোনো সুযোগ তাদের ছিল না। ওই বিরুদ্ধ পরিবেশে সুফিয়া কামালের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি। পারিবারিক নানা উত্থান পতনের মধ্যে তিনি স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন। তারই মধ্যে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। পরবর্তীকালে সাহিত্য সাধনা ও নারী আন্দোলনের ব্রতী হয়ে তিনি শুধু কবি হিসেবে বরণীয় হননি, জননী সম্ভাষণে ভূষিত হয়েছেন। সুফিয়া কামালের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে: ‘সাঁঝের মায়া’ , ‘মায়া কাজল’ , ‘কেয়ার কাঁটা’ , ‘উদাত্ত পৃথিবী’ ইত্যাদি।

এছাড়াও তিনি গল্প, ভ্রমণ কাহিনি, প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা লিখেছেন। বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, নাসির উদ্দীন স্বর্ণপদকসহ বিভিন্ন পদকে ভূষিত হয়েছেন তিনি।

সুফিয়া কামাল ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২০এ নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

মূলকবিতা

===========

œহে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়,

বসন্তে বরিয়া তুলি লবে না কি তব বন্দনায়?”

কহিল সে স্নিগ্ধ আখিঁ তুলি-

æদক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?

বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি আমের মুকুল?

দখিনা সমীর তার গন্ধে গন্ধে হয়েছে কি অধীর আকুল?”

æএখানো দেখনি তুমি, কহিলাম” , æকেন কবি আজ

এমন উন্মনা তুমি? কোথা তব নব পুষ্পসাজ?”

কহিল সে সুদূরে চাহিয়া-

æঅলখের পাথার বাহিয়া

তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান?

ডেকেছে কি সে আমারে? শুনি নাই, রাখিনি সন্ধান।”

কহিলাম, æওগো কবি! রচিয়া লহ না আজও গীত,

বসন্ত-বন্দনা তব কণ্ঠে শুনি-এ মিনতি।”

কহিল সে মৃদু মধু-স্বরে-

æনাই হলো,না হোক এবারে-

আমারে গাহিতে গান, বসন্তেরে আনিতে বরিয়া-

রহেনি, সে ভুলেনি তো, এসেছে তা ফাগুনে স্মরিয়া।”

কহিলাম : æওগো কবি, অভিমান করেছ কি তাই?

যদিও এসেছে তবু তুমি তারে করিলে বৃথাই।"

কহিল সে পরম হেলায়-

æবৃথা কেন? ফাগুন বেলায়

ফুল কি ফোটেনি শাখে? পুষ্পারতি লভেনি কি ঋতুর রাজন?

মাধবী কুঁড়ির বুকে গন্ধ নাহি? করে নাই অর্ঘ্য বিচরন?"

æহোক, তবু বসন্তের প্রতি কেন এই তব তীব্র বিমুখতা?"

কহিলাম æউপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা?"

কহিল সে কাছে সরে আসি-

æকুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী-

গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে

রিক্ত হস্তে! তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোন মতে।"

শব্দার্থ ও টীকা

[illegible] হে কবি-কবিভক্ত এখানে কবিকে সম্বোধন করেছেন।

[illegible] নীরব কেন-উদাসীন হয়ে আছেন কেন? কেন কাব্য ও গান রচনায় সক্রিয় হচ্ছেন না।

[illegible] ফাগুন যে এসেছে ধরায়-পৃথিবীতে ফাল্গুন অর্থাৎ বসন্তের আবির্ভাব ঘটেছে।

[illegible] বরিয়া -বরণ করে।

[illegible] লবে-নেবে।

[illegible] তব বন্দনায়-তোমার রচিত বন্দনা-গানের সাহায্যে। অর্থাৎ বন্দনা-গান রচনা করে বসন্তকে কি তুমি বরণ করে নেবে না?

[illegible] দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?-কবির জিজ্ঞাসা-বসন্তের দখিনা বাতাস বইতে শুরু করেছে কি না। উদাসীন কবি যে তা লক্ষ করেননি তার এই জিজ্ঞাসা থেকে তা স্পষ্ট হয়।

[illegible] সমীর - বাতাস।

[illegible] বাতাবি নেবুর ফুল ... অধীর আকুল-বসন্তের আগমনে বাতাবি নেবুর ফুল ও আমের মুকুলের গন্ধে দখিনা বাতাস দিগ্বিদিক সুগন্ধে ভরে তোলে। কিন্তু উন্মনা কবি এসব কিছুই লক্ষ করেননি। কবির জিজ্ঞাসা তাঁর উদাসীনতাকেই স্পষ্ট হয়।

[illegible] এখনো দেখনি তুমি?-কবিভক্তের এ কথায় আমরা নিশ্চিত হই প্রকৃতিতে বসন্তের সব লক্ষণ মূর্ত হয়ে উঠেছে। অথচ কবি তা লক্ষ করছেন না।

[illegible] কোথা তব নব পুষ্পসাজ-বসন্ত এসেছে অথচ কবি নতুন ফুলে ঘর সাজাননি। নিজেও ফুলের অলংকারে সাজেননি।

[illegible] অলখ -অলক্ষ। দৃষ্টি অগোচরে।

[illegible] পাথার-সমুদ্র।

[illegible] রচিয়া-রচনা করে।

[illegible] লহ-নাও।

[illegible] বরিয়া-বরণ করে।

[illegible] বসন্তেরে আনিতে...ফাগুন স্মরিয়া-কবির বন্দনা-গান রচনা করে বসন্তকে বর্ণনা করলেও বসন্ত অপেক্ষা করেনি। ফাল্গুন আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিতে বসন্ত এসেছে।

[illegible] করিলে বৃথাই-ব্যর্থ করলে। অর্থাৎ কবি-ভক্তের অনুযোগ-বসন্তকে কবি বরণ না করায় বসন্তের আবেদন গুরুত্ব হয়েছিল।

[illegible] পুষ্পারতি-ফুলের বন্দনা বা নিবেদন।

পুষ্পারতি লাভেনি কি ঋতুর রাজন?-ঋতুরাজ বসন্তকে বরণ ও বন্দনা করার জন্য গাছে গাছে ফুল ফোটেনি? অর্থাৎ বসন্তকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্যেই যেন ফুল ফোটে।

[illegible] মাধবী-বাসন্তী লতা বা তার ফুল।

[illegible] অর্ঘ্য বিরচন-অঞ্জলি বা উপহার রচনা। প্রকৃতি বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে ফুল ও তার সৌরভ উপহার দিয়ে বসন্তকে বরণ করে।

[illegible] উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা-কবিভক্ত বুঝতে পারছেন না, কবি যথারীতি সানন্দে বসন্ত বন্দনা না করে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন কেন।

[illegible] কুহেলি- কুয়াশা।

[illegible] উত্তরী- চাদর। উত্তরীয়।

[illegible] কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী-কবি শীতকে মাঘের সন্ন্যাসীরূপে কল্পনা করেছেন। বসন্ত আসার আগে সর্বত্যাগী সর্বরিক্ত সন্ন্যাসীর মত মাঘের শীত যেন কুয়াশার চাদর মিলিয়ে গেছে।

[illegible] পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথ-শীত প্রকৃতিতে দেয় রিক্ততার রূপ। গাছের পাতা যায় ঝরে। গাছ হয় ফুলহীন। শীতের এরূপকে বসন্তের বিপরীত স্থাপন করা হয়েছে। প্রকৃতি বসন্তের আগমনে ফুলের সাজে সাজলেও কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ততার ছবি। শীত যেন সর্বরিক্ত সন্ন্যাসীর মত কুয়াশার চাদর গায়ে পত্রপুষ্পহীন দিগন্তের পথে চলে গেছে।

[illegible] তাহারেই পড়ে মনে-প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ত ও বিষণ্ন ছবি। কবির মন দুঃখ ভারাক্রান্ত। তার কন্ঠ নিরব। শীতের করুণ বিদায়কে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। তাই বসন্ত তার মনে সাড়া জাগাতে পারছে না। বসন্তের সৌন্দর্য তার কাছে অর্থহীন, মনে কোন আবেদন জানাতে পারছে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর প্রথম স্বামী ও কাব্যসাধনার প্রেরণা-পুরুষের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির অন্তরে যে বিষণ্নতা জাগে তারই সুস্পষ্ট প্রভাব ও ইঙ্গিত এ কবিতায় ফুটে উটেছে।

পাঠ-পরিচিতি

æতাহারেই পড়ে মনে” কবিতাটি ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ‘মাসিক মোহাম্মাদী’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এ কবিতায় প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি পেয়েছে। সাধারণভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য মানবমনের অফুরন্ত আনন্দের উৎস। বসন্ত-প্রকৃতির অপরূপসৌন্দর্য যে কবিমনে আনন্দের

শিহরন জাগাবে এবং তিনি তাকে ভাবে ছন্দে সুরে ফুটিয়ে তুলবে সেটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু কবিমন যদি কোন কারণে শোকাচ্ছন্ন কিংবা বেদনা ভারাতুর থাকে তবে বসন্ত তার সমস্ত সৌন্দর্য সত্ত্বেত কবির অন্তরকে স্পর্শ করতে পারবে না।

এ কবিতায় কবির ব্যক্তি জীবনের দুঃখময় ঘটনার ছায়াপথ ঘটেছে। তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে (১৯৩২) কবির জীবন প্রচণ্ড শূন্যতা নেমে আসে। তার ব্যক্তিজীবন ও কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে নেমে আসে এক বিষণ্নতা। কবিমন আচ্ছন্ন হয়ে যায় রিক্ততার হাহাকারে। æতাহারেই পড়ে মনে” কবিতাকে আচ্ছন্ন করে আছে এই বিষাদময় রিক্ততার সুর। তাই বসন্ত এলেও উদাসীন কবির অন্তর জুড়ে রিক্ত শীতের করুণ বিদায়ের বেদনা।

কবিতাটির আরেকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর নাটকীয়তা। গঠনরীতির দিক থেকে একটি সংলাপনির্ভর রচনা। কবিতার আবেগময় ভাববস্তুর বেদনাঘন বিষণ্নতার সুর এবং সুললিত ছন্দ এতই মাধুর্যমণ্ডিত যে তা সহজেই পাঠকের অন্তর ছুঁয়ে যায়।